Indian Science News Association
ESTD.–1935

বিজ্ঞান কথন

কলকাতা/ফেব্রুয়ারী ২৯, ২০২৪, বৃহস্পতিবার, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

Indian Science News Association
ESTD.–1935

ধন্য রাজনীতি

প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমাদের এই প্রিয় পত্রিকায় রাজনীতির আঙিনায় নিজেরা পা রাখব না। দেব না কারও লেখায় রাজনীতি ছুঁতে। আমাদের বিজ্ঞান কহনের মূল লক্ষ্যই থাকবে বিজ্ঞানের সম্প্রচার ও জনপ্রিয়করণ। কিন্তু আজ পরিস্থিতির চাপে আমরা নিজেদের কথা নিজেরাই বোধহয় গিলে ফেলতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ, রাজনীতিই আমাদের গিলে ফেলছে। আজ জীবনের প্রতি পদে পদে রাজনীতির অনুপ্রবেশ। রাজনীতিই আমাদের পরিচালন করে, রাজনীতিই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতিই আমাদের পাল তুলে দেয়, আবার মাঝ গঙ্গায় ডুবিয়েও দেয় রাজনীতি। রাজনীতিতেই শুরু, রাজনীতিতেই শেষ।

বহুকাল আগে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অম্লান দত্ত একটি বিখ্যাত পাক্ষিক পত্রিকায় আমাদের "অস্তিত্বের সংকট" -এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। আজ অতি দুঃখের সঙ্গে আমাদের এই ভয়াবহ বার্তা আবার মনে করতে হচ্ছে। না হলে আজ শতাব্দী প্রাচীন জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস বন্ধ হয়ে যায়, বিজ্ঞান প্রসারের নাভিশ্বাস ওঠে?

অনেক কিছুই হয়তো মানা যায় না তবু মেনে নিতে হয়। কিন্তু ১০০ বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান কংগ্রেসের স্থগিত হয়ে যাওয়া মেনে নেওয়া দুষ্কর। কিছু কিছু পন্ডিত প্রবর হয়তো বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন, একে বাৎসরিক "কার্নিভ্যাল" বা "জাম্বোরি" আখ্যায় সম্বোধিত করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান কংগ্রেসের ইতিহাস বা ঐতিহ্য পর্যালোচনা করলে এ ধরনের সমালোচনা নেহাত বালখিল্যেরই মন্তব্য মনে হয়। কত না মনিষী বিজ্ঞানী এই বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন তার ইয়ত্তা মেলা ভার। কত না তরুন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অধিবেশনে এই জ্ঞানী জন মানসের সামনে নিজেদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন তাও গোণা মুস্কিল।

স্বভাবতই সকলেই এবার হতাশ হয়েছেন। বিজ্ঞান কংগ্রেস আবার কোনদিনও অনুষ্ঠিত হবে কি না তাই নিয়ে একটি বিরাট সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। অথচ বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরিধি হয়তো একমাত্র আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সের সঙ্গেই তুলনীয়।

তেমনই তোলা যেতে পারে বিজ্ঞান প্রসারের কথা। নামেই পরিষ্কার এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি? সারা বছর ধরে, সারা দেশ জুড়ে এই সংস্থাটি নানা কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িয়ে রাখত। বিভিন্ন ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করা ছাড়াও বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান প্রদান করত যাতে বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করা যায়। এই কর্মকান্ড সচল রাখতে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জায়গায় ছুটে যেতেন, কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিরলস আলোচনা করতেন যাতে বিজ্ঞান সচেতনতার ঢেউ সারা দেশে আছড়ে পড়ে।

অথচ আজ এই সমস্ত কর্মকান্ড বন্ধ হয়েছে কারণ বিজ্ঞান প্রসারের দরজায়ও তালা ঝুলেছে। সংস্থার কর্তাব্যক্তিরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বিজ্ঞান প্রসারের অনুদানের উপর ভরসা করে নিজেদের কার্যধারা বজায় রাখতেন আজ তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হতে হচ্ছে। তাদের সামনের পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন, কর্দমাক্ত।

অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে বিজ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছে কখনই জনপ্রিয় নয়, সহজবোধ্যতো নয়ই। আর সেখানেই বিজ্ঞান প্রসারের প্রাসঙ্গিকতা এবং তার সূত্রে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা। আনুষঙ্গিক অন্যান্য কিছুর কথা না ধরলেও এই কর্মকান্ড চালু রাখতে অর্থের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। সমুদ্রের জলই যদি শুকিয়ে যায় নদী নালা খালবিল বাঁচে কি করে?

কাজেই কালবিলম্ব না করে সামগ্রিক অবস্থার আশু পর্যালোচনা প্রয়োজন। প্রয়োজন স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনা যাতে সব কিছু স্বাভাবিক হয় এবং পূর্বাবস্থা ফিরে আসতে পারে। বিজ্ঞান সতত গতিশীল। এক জায়গায় কখনও থেমে থাকে না। অন্য দেশে যখন বিভিন্ন কার্যসূত্রে বিজ্ঞান জনপ্রিয় হয়ে উঠছে আমরা কি তখন পুরাকালে ফিরে যাব? ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে পংক্তিটি আবার কি নতুন করে লিখতে হবে?

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু একবার বলেছিলেন, আমাদের দেশের বিজ্ঞান লেখকদের শুধু বিজ্ঞান জানলেই হবে না। তাদের চেষ্টা চাই যারা বিজ্ঞান বোঝেনা তাদেরও বিজ্ঞান বুঝিয়ে দেওয়ার এবং সেইমতো একটা ভাষার সৃষ্টি করা তাদের দায়িত্ব। আজ বিজ্ঞানাচার্য বেঁচে থাকলে আমরা তাঁকে হয়তো জিজ্ঞাসা করতাম যে কলমের কালিই যদি শুকিয়ে যায় ভাষা সৃষ্টি হয় কি কি ভাবে?

boseprasanta@
hotmail.com
arnab_jour@
yahoo.co.in

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে বিজ্ঞান সংগঠকের ভাবনা

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স ৭৫ পেরিয়ে গেছে। উৎসাহে এক ফোঁটা ভাঁটা পড়েনি। যুবক বয়স থেকে যে স্বপ্ন দেখতেন আজও তা বিদ্যমান । মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের কাজ যাঁরা করেন তাদেরকে খুঁজে বার করা এই মানুষটির লক্ষ্য। নিজেও বিজ্ঞান প্রচারের কাজ করেন। একজন বিজ্ঞান সংগঠক কিভাবে হতে হয় তা তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

প্রতিবছর উনি জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে বিজ্ঞান প্রচারকদের পুরস্কার দিয়ে থাকেন তাঁর সংগঠনের মাধ্যমে। এই পুরস্কারের তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান লেখক, বিজ্ঞান গবেষক, বিজ্ঞান সম্প্রচারক, বিজ্ঞান প্রচারক--এরকম নানা ক্ষেত্রের মানুষজন। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার, গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি পুরস্কার, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্মৃতি পুরস্কার, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা স্মৃতি পুরস্কার, বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ স্মৃতি পুরস্কার, ডা: নীলরতন সরকার স্মৃতি পুরস্কার, ডা: বিধান চন্দ্র রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রভৃতি পুরস্কারের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেন বহু সায়েন্স কমিউনিকেটরকে। বিজ্ঞান সংগঠনদেরও পুরস্কার দেন। ভারতের প্রথম বিজ্ঞানে নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী ড. সিভি রমণ নামাঙ্কিত স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় বিজ্ঞান সংগঠনকে ।

এতক্ষণে মনে হয় অনেক পাঠকই বুঝতে পেরে গেছেন এই কলম লেখক কার কথা বলছেন । হ্যাঁ, ড. শুভব্রত রায় চৌধুরীর কথা ; প্রাক্তন উপাচার্য এবং দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সম্পাদক।

দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে আমি চিনি, ছোট থেকেই দেখছি, একজন বিজ্ঞান সংগঠক কিভাবে নিঃশব্দে কাজ করেন। কয়েকদিন আগে যখন তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমি প্রশ্নটা ছুঁড়েই দিলাম তাঁকে । এই বয়সে এসেও এত উৎসাহ পান কি করে ? এক গাল হেসে বললেন, আমার চিন্তনে ও মননে বিজ্ঞান প্রচার একাত্ম হয়ে গেছে। প্রায় ৪০ বছর আগে যখন দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল তৈরি হয়, তখন তার মূল লক্ষ্যই ছিল মানুষের মধ্যে খুব সহজভাবে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেওয়া । শুধু শহরের মানুষের মধ্যে নয় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও বিজ্ঞানকে সঙ্গী করে দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল বহু কাজ করেছে; এখনও করছে । আর তার মূল কান্ডারী ড. শুভব্রত রায় চৌধুরী।

কথায় কথায় তিনি বললেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় ফাদারের সঙ্গে কাজ করার

অভিজ্ঞতা আজীবন তাঁকে সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ করার ক্ষমতা যোগায়। একসময় সারা বাংলা জুড়ে এমনকি বাংলার বাইরে দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের কাজ হতো। পাহাড় থেকে সাগর, সুন্দরবন থেকে জঙ্গলমহলে বহু প্রকল্প চলতো দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের উদ্যোগে। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সহযোগিতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বহু সুফল, প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল - এই কথাই বলছিলেন সম্পাদক ড. রায় চৌধুরী ।

একই সঙ্গে বিজ্ঞান প্রচারক তৈরি করার জন্য বিজ্ঞান সাংবাদিকতার একটি কোর্স নিয়মিতভাবে আয়োজন করতো দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। সংস্থার মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছে বিজ্ঞান মেলা নামে বিজ্ঞান পত্রিকাটি। আজও এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান প্রচারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য (দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর মাধ্যমে) যখন শুভব্রত বাবু বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মৃতি পুরস্কার দেওয়ার পরিকল্পনা করেন তখন বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে এই ভাবনা সে ভাবে কেউ ভাবেননি। পরবর্তী ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিজ্ঞান প্রচারকদের পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় । কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক বেশ কয়েক বছর হলো বিজ্ঞান প্রচারকদের পুরস্কার দিচ্ছেন । ড. শুভব্রত রায়চৌধুরীর এই উদ্যোগের অনেক বছর পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ড.গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার চালু করে।

কথায় কথায় তিনি বলছিলেন, "পুরস্কারের জন্য সবাইকে বিভিন্ন সংস্থায় আবেদন করতে হয়। কিন্তু দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর পুরস্কার যারা পান তাঁরা কেউ আবেদন করে পুরস্কার পান না। সমাজ থেকে এই গুণী মানুষদের খুঁজে নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের"।

৭০- ৮০ র দশকে সারা ভারত জুড়ে বিজ্ঞান ক্লাব তৈরি হয়েছিল। ৮০ র দশকে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি কমিউনিকেশন (এন সি এস টি সি) যখন ভারত সরকারের উদ্যোগে তৈরি হয় তখন বিজ্ঞান ক্লাবগুলো আরও সঙ্ঘবদ্ধ হয়। পূর্ব ভারত বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে ওঠে এই সময়। দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এই পূর্ব ভারত বিজ্ঞান ক্লাবের নানা উদ্যোগের সঙ্গী হয়েছিল।

দুঃখ করে বলছিলেন এখন আর বিজ্ঞান ক্লাব গুলো সেভাবে কাজ করতে পারছে না। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান ক্লাবের দিকে আগ্রহী হচ্ছে না, ফলে বিজ্ঞান প্রচারের কাজটা বিঘ্নিত হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম নতুন ছেলে মেয়েরা যদি এই কাজে না আসে তবে বিজ্ঞান প্রচার কি বন্ধ হয়ে যাবে ? উনি বললেন না, তা কেন হবে ? বিজ্ঞান প্রচারের পদ্ধতিটা আমাদের পাল্টাতে হবে।

এখন ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগ। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ডিজিটাল প্রযুক্তিতে খুবই সচ্ছন্দ। সুতরাং তাদেরকে এই প্রযুক্তির মাধ্যম দিয়ে বিজ্ঞান প্রচারের কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে । আসলে ভাবনাটাই হল কনটেন্ট; পুরনো দিনের বিজ্ঞান প্রচারক যাঁরা আছেন, তাঁদের কাজ হবে এই নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞান ভাবনায় উদ্দীপিত করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে সায়েন্স কমিউনিকেশন কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়
বিভাগীয় প্রধান
সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ
বিজয়গড় জ্যোতিষরায় কলেজ,
arnab_jour@yahoo.co.inyahoo.co
.in

চুরাশির চল্লিশ বছর

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশগত দুর্ঘটনার কথা বললেই আমাদের মনে পড়ে ১৯৮৪-এর ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ের কথা। সে-বছর ডিসেম্বরের ২ তারিখ মাঝরাতে ইউনিয়ন কারবাইড-এর কারখানা থেকে বের হয়েছিল অত্যন্ত বিষাক্ত মিথাইল আইসোসায়ানেট বা মিক গ্যাস। তার ফলে অন্তত তিন হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলেন। রাসায়নিক দূষণের শিকার হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন দু'লক্ষের ওপর মানুষ। পৃথিবীর মানুষের তৈরি করা পরিবেশ বিপর্যয়ের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ভোপাল।

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার ১৯৮৪-তে শুধু ভারতের ভোপালে নয়, অন্তত আরও দুটো খুব বড়ো পরিবেশ বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছিল পৃথিবীর অন্য দুই প্রান্তে।

১৯৮৪-এর ২৫ ফেব্রুয়ারিতে ব্রাজিলের কুবাতাও শহরে পেট্রোল পাইপের ফুটো দিয়ে পেট্রোল বের হতে থাকে। তেলে আগুন এসে পড়ে। তা থেকে আগুন লেগে যায় পাইপে। শহরে আগুন ছড়িয়ে

পড়ে। জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান ছ'শোর ওপর মানুষ। আহত হন প্রায় তিন হাজার মানুষ।

এর ন'মাস পরে মানুষের তৈরি আর এক পরিবেশগত দুর্ঘটনার সাক্ষী হয় এই পৃথিবী। সেই ঘটনা ঘটেছিল পৃথিবীর আর এক প্রান্তে, মেক্সিকোতে। সেখানেও ঘটে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। তবে আগুনে ইন্ধন যোগায় অন্য দাহ্য পদার্থ। ব্রাজিলের ক্ষেত্রে আগুনের উৎস ছিল পেট্রোল আর মেক্সিকোয় আগুন লাগাল রান্নার গ্যাস, অর্থাৎ লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এল পি জি।

দুর্ঘটনাটি ঘটে চুরাশির ১৯ নভেম্বর। মেক্সিকোর শহরতলি অঞ্চল ইক্সোটেপেকে ঘটেছিল এই মারক ঘটনা। সেখানে একের পর এক গ্যাস সিলিন্ডার ফাটতে শুরু করে। এই ভয়াবহ বিস্ফোরণ চলতে থাকে এক ঘণ্টা ধরে। গ্যাস সিলিন্ডারের গুদামে আগুন লাগায় মারা যান প্রায় পনেরো হাজার মানুষ, আহত হন আরও সাত হাজার।

ব্রাজিল, মেক্সিকো, ভারত, পৃথিবীর তিন প্রান্তে চল্লিশ বছর আগে ঘটা তিন পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে ক্ষতি হয়েছিল মানুষের, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল প্রকৃতি। আর এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ছিল মানুষ। দায়ী তাদের অসতর্কতা, অবিবেচনা। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে আমরা শিক্ষা পেয়েছিলাম পরিবেশগত দুর্ঘটনা কী ভয়াবহ আর মারক হতে পারে।

কিন্তু সেই শিক্ষা কি আমরা নিতে পেরেছি?

সহযোগী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
sabya4@klyuniv.ac.in

Indian Science News Association (ISNA), Kolkata

cordially invite you to the

Celebration of National Science Day 2024
on Thursday, 29th February, 2024 at 4.30 p.m.

Theme: Indigenous Technologies for Viksit Bharat

Venue:
N.R. Sen Auditorium, University of Calcutta, Rashbehari Siksha Prangan,
Rajabazar Campus, 92, Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkata - 700 009

Speaker:
Dr. Rupali Gangopadhyay, Associate Professor, Department of Chemistry,
Sister Nivedita University

Guest of Honour:
Dr. Indranil Sanyal, Former Director (Headquarters),
National Council of Science Museums

Chief Guest:
Professor Santa Dutta (De), Vice-Chancellor, University of Calcutta

to be presided over by:
Professor (Mrs.) Julie Banerji
Vice-President, ISNA and former Khaira Professor and Head of the Department of Chemistry,
University of Calcutta

Professor Manas Chakrabarty
Honorary Secretary, ISNA

Dr. Amit Krishna De
Honorary Secretary, ISNA

INDIAN SCIENCE NEWS ASSOCIATION
Phone: 033-23502224
Dated: 21/02/2024

মস্তিষ্কের অনুকরণ

অরুণ বরণ সমাদ্দার ও সায়ন্তন ঘোষ

পূর্বাভাস:

পঞ্চাশ দশকের এক বিখ্যাত চলচ্চিত্র, 'হারানো সুর' এবং এর মূল আমেরিকান চলচ্চিত্র, 'Random Harvest' এ নায়কের একটা বিশেষ সময়ের স্মৃতি সম্পূর্ণ ভাবে হারিয়ে যাওয়ায় মর্মান্তিক বিয়োগান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। আবার হলিউডের কল্পবিজ্ঞান চলচ্চিত্র, The Matrix, Inception বা রূপকথা, সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' মগজ ধোলাইয়ের মানে মস্তিষ্কের তথ্য এডিট ক'রে বদলে দেবার কথা বলা হয়েছে। এসব পরোক্ষ বাস্তব ছাড়া প্রত্যক্ষ বাস্তবেও আগাথা ক্রিস্টির কিছুদিনের স্মৃতি পুরো হারিয়ে গিয়েছিল যা তিনি আর ফিরে পান নি। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম তো স্থায়ীভাবে স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিলেন। মস্তিষ্কের কার্যকরী প্রতিরূপ তৈরি করার বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং অতি উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) বাস্তবায়নের পথে।

সূচনা:

পৃথিবীতে এক কোষী প্রাণের সূত্রপাত ৪.৫ থেকে ৩.৭ এধ (এরমধ ধহহঁস) আগে। বিবর্তনের পথে ক্রমশঃ উচ্চতর প্রাণের উদ্ভব হল কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে। তার মধ্যে এক ধরনের কোষের নেটওয়ার্ক বা স্নায়ুতন্ত্র চিন্তা করতে সমর্থ এবং প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশে সংকেত আদানপ্রদান ক'রে ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক কাজের সমন্বয় সাধন করে সুখ-আনন্দ-বেদনার উৎস। এদের মধ্যে মুখ্য কোষ হল নিউরন।

কোষ-দেহ ছাড়া নিউরনের অন্য প্রধান ভাগ অ্যাক্সন, ডেনড্রাইট ইত্যাদি সংকেতের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানে অপরিহার্য। নিউরন থেকে নিউরনে সংকেত আদান-প্রদান হয় স্নায়ুসন্ধির মাধ্যমে, রাসায়নিক বা বৈদ্যুতিকভাবে। নিউরনের অ্যাক্সনের আউটপুট পার্শ্ববর্তী নিউরনগুলির ডেনড্রাইটে ইনপুট; মাঝে থাকে সাইন্যাপ্স। ছবিতে একটি নিউরনে মাত্র কয়েকটি অ্যাক্সন এবং ডেনড্রাইট দেখান হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তারা অসংখ্য। একটি নিউরনের জন্য প্রায় ১৫০০০ সাইন্যাপ্স থাকে। অধিকাংশ প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান দুটি অংশ থাকে। প্রথম, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মস্তকে নিউরন, স্নায়ুসন্ধি ইত্যাদি দিয়ে গঠিত। দ্বিতীয়, প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র শরীরের ছড়িয়ে, যা দীর্ঘ, সরু, নলাকার স্নায়ু-গুচ্ছ, অ্যাক্সন দ্বারা আবৃত। মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় ১০০ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন=১০০ কোটি) নিউরন থাকে, যা আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জ, আকাশগঙ্গার (Milky Way) তারার সংখ্যার সমান, যদিও কারও মতে তারার সংখ্যা আরও অনেক বেশি (NASA)। সাইন্যাপ্সের সংখ্যা ১০০ ট্রিলিয়নের কাছাকাছি (১ ট্রিলিয়ন=১ লক্ষ কোটি), Colón-Ramos Lab, ইয়েল চিকিৎসাশাস্ত্রীয় শিক্ষালয় এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় অনুযায়ী।

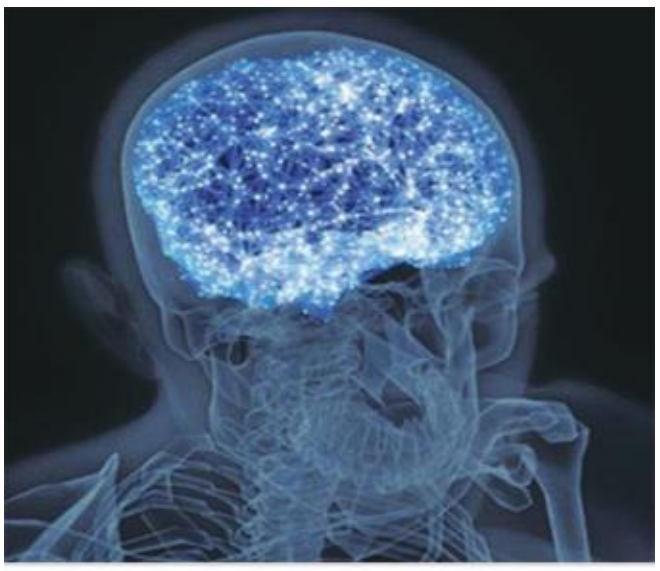

Image from Scientific American

এছাড়াও রয়েছে দর্পণ স্নায়ু (Cortex) যা প্রাণীদের অন্যের কার্যকলাপ অনুকরণ করতে সাহায্য করে যেমন করে। প্রসঙ্গত এককোষী প্রাণ এবং স্পঞ্জের এখন পর্যন্ত কোন স্নায়ুকোষ পাওয়া যায়নি। আবার বিশালাকার ওরকার (Orca or Killer Whale) মস্তিষ্কের ওজন প্রায় ৭.৫ কিলোগ্রাম আর মানুষের ১.৫ কিলোগ্রাম, কিন্তু ওরকার নিউরনের সংখ্যা মানুষের তুলনায় অনেক কম। মস্তিষ্কের কার্যকলাপ খুব জটিল। তাই Whole Brain Emulation (WBE), কথ্য ভাষায় নিয়ে গবেষণা চলছে এবং অনেক অগ্রগতিও হয়েছে।

বর্তমান প্রযুক্তি Whole Brain Emulation একটি প্রকল্পিত পদ্ধতি, মস্তিষ্ক স্ক্যান ক'রে মস্তিষ্কের নেটওয়ার্কের নকশা, টোপোলজি এবং ক্রিয়াকলাপের ফ্লো-চার্ট তৈরি ক'রে তার কার্যকরী ডিজিটাল মডেল অর্থাৎ কৃত্রিম স্নায়বিক নেটওয়ার্ক (Artificial Neural Network ev ANN) তৈরি করা। এই দুরূহ কাজের জন্য বিশেষ কিছু প্রযুক্তি বা প্রযুক্তির সমন্বয় যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার হয়, যেমন রঞ্জন-রশ্মি (X-Ray), EEG, CT Scan, MRI, PET (Positron Emission Tomography) scan, LT-HS-AFM (Long Tipped High Speed Atomic Force Microscopy)। এর সাথে বেশ কিছু জীববিজ্ঞানের এবং কম্পিউটিং কৌশল প্রয়োগ করার প্রয়োজন, যেমন স্নায়ুবিজ্ঞান (Neuroscience), স্নায়ুতত্ত্ব (Neurology), স্নায়বিক প্রযুক্তি (Neural Engineering), কার্যকরী নিবেশক (Functional Recording), স্নায়ুভিত্তিক (Neuromorphic) কম্পিউটিং, AI, ANN, Machine Learning (ML), মস্তিষ্ক সংরক্ষণ (Brain Preservation), গণনামূলক (computational) মডেলিং ইত্যাদি।

এখন পর্যন্ত যত অঘঘ এমনকি যত ডীপ লার্নিং নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে তা মানুষের মস্তিষ্কের অনুকরণে হলেও তার অতি সামান্য এক টুকরোরই সন্ধান মিলেছে। আপাতত ইঁদুরের সম্পূর্ণ স্নায়ুতন্ত্র নকলের চেষ্টা হচ্ছে, যার নিউরনের সংখ্যা মাত্র দু কোটির মত। সুইজারল্যান্ড Federal Institute of Technology Lausanne এ Blue Brain প্রজেক্ট এখন পুরোভাগে; নেতৃত্বে রয়েছেন এক ইজরায়েলী বিজ্ঞানী হেনরি ম্যারক্রাম।

অন্তরায় (challenges):

মস্তিষ্ক স্ক্যানিং/ইমেজিং-এর জন্য বিনাশী পরীক্ষা যন্ত্র, যেমন Scanning Electron Microscope (SEM) উপযুক্ত নয় কারণ তা মস্তিষ্কের জন্য অপূরণীয় ক্ষতিকারক। অন্যদিকে অবিনাশী যন্ত্র যেমন গজও এবং গঊএ ইত্যাদির ২০৬০ সালের আগে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্জন করার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া মস্তিষ্ক স্ক্যানিং/ইমেজিং এ অনেক অগ্রগতির ফলে মস্তিষ্কের নকশা/মানচিত্রকরণ অনেকটা সম্ভব হলেও এখনও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ বিস্তৃতভাবে বোঝা যায়নি।

মানুষের মস্তিষ্ক অনুকরণ করতে কম্পিউটারের অতি বিপুল প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা প্রয়োজন। বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী সুপারকম্পিউটারেরও সে ক্ষমতা নেই। মস্তিষ্কে হাজার হাজার কোটি নিউরন, লক্ষ লক্ষ কোটি স্নায়ুসন্ধি, তাদের মধ্যে যোগসূত্র, এবং তার সাথে তাদের ধর্ম এবং ক্রিয়াকলাপ। এত তথ্যের জন্য করার জন্য বিপুল সংরক্ষণ যন্ত্র প্রয়োজন, সঙ্গে অবশ্যই অতি শক্তিশালী কম্পিউটিং এবং তথ্য ইনপুট-আউটপুটের ব্যবস্থা।

উপসংহার এবং ভবিষ্যৎ:

প্রায় দশ বছর আগে অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় স্টুয়ার্ট হ্যামারফ এক কম্পিউটার সিস্টেম বানিয়েছেন যা রোগীর বা কোন মানুষের মেজাজ বদলে দিতে পারে, মস্তিষ্কের নক্সা অনুযায়ী বিশিষ্ট স্থানে আল্ট্রাসাউন্ড প্রয়োগ করে। ডইঊর সফলতা অনেক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে বিপ্লব আনবে, যেমন স্নায়ুবিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, চিকিৎসা বিজ্ঞান। কিন্তু তার জন্য অনেক প্রযুক্তিগত, নৈতিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক অন্তরায় কাটিয়ে উঠতে হবে।

মস্তিষ্কের তন্ত্র অনুকরণে তৈরি অঘঘ, রোগ নির্ণয় থেকে নক্ষত্রপুঞ্জের শ্রেণীবিভাগের মত দুরূহ কাজে রত। কিন্তু সম্পুর্ণ স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে যে তথ্য আদান প্রদান এবং সংরক্ষন করা হচ্ছে, তা ডিজিটাইজ করে কম্পিউটারে ব্যাকআপ নেওয়া আরও অনেক জটিল এবং দুঃসাধ্য।

কোয়ান্টাম কম্পিউটারের অসীম প্রক্রিয়াকরণের এবং সংরক্ষণের ক্ষমতা মস্তিষ্কের অনুকরণ এবং প্রতীয়মান করায় আমূল পরিবর্তন আনবে। কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার এখনও গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কাজ করছে। এলন মাস্ক শুকরের মাথায় ঠখঝও চিপ বসিয়ে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবি করেছেন।

মস্তিষ্ক অনুকরণের সাফল্যে মানবতার কতটা উন্নতি হবে, সে ভিন্ন প্রশ্ন। তবে WBE গবেষণা মানুষের মন, সম্পর্ক, চেতনা এবং দার্শনিক তত্ত্বের নূতন দিগন্ত খুলে দেবে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব চেতনার অভিমুখে ব'লে বিজ্ঞানীরা চেতনা অনুকরণের গবেষণায়ও লিপ্ত হচ্ছেন। কিন্তু দার্শনিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা এবং ডিজিটাল মডেল করায় অনেক পার্থক্য; উপনিষদে ব্যাখ্যা করা চেতনার স্বরূপ এবং কিভাবে চেতনা কাজ করে তার গাণিতিক বর্ণনা করা থেকে বিজ্ঞান এখনও অনেক দূরে। নিকোলা টেসলার কিছু চিঠি অনুযায়ী তিনি এরকম চেষ্টায় স্বামী বিবেকানন্দের সাথে সম্মুখে পরামর্শ করতে চেয়েছিলেন। তার আগেই তিনি মারা যান।

কোয়ান্টাম কম্পিউটার এক থেকে দুই যুগের মধ্যেই সহজলভ্য হবে, এবং তার ক্ষমতা, মস্তিষ্ক সম্পর্কে আহরণ করা তথ্যের স্বল্পতা কিছুটা পূরণ করবে। ফলস্বরূপ এই শতকের মাঝামাঝি, AI এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সংযোগে অ্যালঝাইমার্স, পারকিনসন, ডিসলেক্সিয়া, মৃগীর মত রোগের চিকিৎসা এবং সন্ত্রাসবাদী, সাইকোপ্যাথ ইত্যাদিদের বিশ্লেষণ করা অনেক সহজ হবে। কিন্তু, যদি বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম এবং রাষ্ট্র সব মিলে মস্তিষ্ক অনুকরণের প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ না করতে পারেন, তাহ'লে মানুষের অকল্পনীয় অকল্যাণ ডেকে আনতে পারে।

উপদেষ্টা, জে আই এস টেকনিক্যাল ইনিশিয়েটিভ,
উপদেষ্টা, অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর
টেকনিক্যাল এডুকেশন
absamaddar@yahoo.com

আজকের বিজ্ঞান প্রযুক্তি: এক আলোচিত দিক

দেবপ্রসন্ন সিংহ

যুগে যুগে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষণ পঠন পাঠন নিয়ে অজস্র লেখা পড়া শোনা চলেছে, বিভিন্ন মাধ্যমে। ভেদাভেদে এসেছে বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে চিন্তা ও কল্পনাশক্তি, বিচার ক্ষমতা, যুক্তিবোধ, স্মরণশক্তি, সৃজনশীলতা ইত্যাদি। এসেছে আজকের বহু আলোচিত 'কৃত্রিম বুদ্ধি'।

কম্পিউটার যন্ত্র ও অন্যান্য প্রকরণ তার বিশাল তথ্য বিবিধ ভাষা নিয়ে আজ মানব জগতে এমন এক পর্যায়ে হাজির হয়েছে যে সাধারণ বুদ্ধি এবং সৃজনশীলতাও এর কাছে সমর্পণ করতে বাধ্য। অবশ্য উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিভিন্ন জ্ঞান ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে প্রথম কথা বা প্রাথমিক ইনপুট দিয়ে যাচ্ছেন। কাঠামোটি বদলে বদলে ভাষায় প্রকাশ ও পরিবর্তন করছেন, বলে যাচ্ছেন, লিখে যাচ্ছেন সে কথা বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে।

স্বাভাবিকভাবেই, উচ্চতররা প্রতি মুহূর্তে অন্যদের আধুনিক যুগোপযোগী স্মার্ট করার চেষ্টায় নতুন নতুন জীবনশৈলীতে বেশি ব্রতী। হয়তো শেষ কথা তারাই বলবেন, হয়তো তা যন্ত্র-শাসিত। মাঝারিরা যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দাক্ষিণ্যে জীবন টেনে বয়ে নিয়ে যান, তারা কিছুটা আশায় আলোকিত, কিছুটা আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। অর্থনীতিবিদের সুরেও এই সংশয়বাণী শোনা যাচ্ছে। সেই সব অঢেল লেখার সালতামামি করা এখানে উদ্দেশ্য নয়, সম্ভবও নয়। আমি জানি তার সারাংশ অদূর ভবিষ্যতে অও-সৃষ্ট নিয়ন্ত্রকের কাছে আসতে হবে, অনেক জনকে সাথী করার উদ্দেশ্যে আরও অনেক কম পড়ুয়াদের সাহায্য করবে বলে।

যেমন করে কি না অন্যভাবে সাহায্য করে লেখায় চুরি বা কুম্ভিলকবৃত্তি ধরা বা কমানোয়, অলীক অবান্তর অসমর্থিত সংবাদ আরও না ছড়ানোর বিশেষ প্রতিষেধকে। যুগে যুগে এই পরিবর্তন বা বিবর্তন বা বিপ্লব ঘটেই চলেছে, মানবজাতি এক ধরনের অস্তিত্বের ও ব্যাখ্যা মেনে বদলে বদলে যান, বাদপ্রতিবাদের অবকাশ রেখেও। যে কোনও পরিবর্তন সকলের কাছেই সহসা কাম্য নয়, তার যাচাই হয় দ্রুত বা যথাযথ সময়ে পরে রুপায়ণে।

বিজ্ঞান বা বিশেষ করে প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রচলন আজ বড়ই দ্রুত এবং আগ্রাসী বণিকী চাপে দুষ্ট ও পিষ্ট। পারমাণবিক বোমা, অন্য আধুনিক অস্ত্রের নির্মাণ ও যুদ্ধে ব্যবহার বা ব্যাপক ইন্টারনেটে যন্ত্রাদি দেশে বিদেশে প্রতিভাবান ও দক্ষ অপরাধীদের নতুনভাবে শান দেওয়াচ্ছে নানান বৌদ্ধিক অস্ত্রে। স্তরে স্তরে ভাগ করা এই বিশ্বমানবগোষ্ঠী আরও বেশি ডিজিটাল ডিভাইডে বিভক্ত এবং অপ্রস্তুত তার স্বীকৃত ও পরীক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায়, কম বা বেশি বয়সে।

সমাধানে, অওএর যে ঢেউ বিপুলভাবে ধেয়ে আসছে, যার প্রতিরোধ সর্বদা সম্ভব নয়, উচিতও নয়, বিশেষ করে চিকিৎসাক্ষেত্রে, তাই নিজেকে আগাম সতর্কতামাফিক সেইসব জ্ঞানে একটু এগিয়ে রাখা দরকার, যেমন করে জান্তেঅজান্তে অনেক পরিষেবায় বিনোদনে ডিজিটাল বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করেছি বা তাদেরকে ছাড়া চলতেও পারছি না।

সভ্য,
কমপিউটার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া
devaprasannasinha@rediffmail.com

অ্যাটোসেকেন্ড

সায়রী বিশ্বাস

অ্যাটোসেকেন্ড, এত্ত ছোট!!! কিন্তু ঠিক কতটা ছোট? ব্রহ্মাণ্ডের বয়সের সামনে এক সেকেন্ড মাত্র। অর্থাৎ, এই ব্রহ্মাণ্ডের বয়সকে যদি সেকেন্ডে প্রকাশ করা হয় তবে সেই সংখ্যা আর এক সেকেন্ডের মধ্যে থাকা অ্যাটোসেকেন্ড এর সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি। অঙ্কের ভাষায় এক সেকেন্ডের লক্ষ লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ (১০১৮ সেকেন্ড), সময়ের ক্ষুদ্রতম ব্যবহারিক একক।

কিন্তু এত ক্ষুদ্র বিষয়, মানে ক্ষুদ্র সময়, নিয়ে মাথা ব্যথার কারণ? কোনো পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের গতিবেগ হয় সেকেন্ডে প্রায় ২২০০ কিলোমিটার, যা আলোর বেগের কাছাকাছি। পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে পারলে এই ইলেকট্রন সময় নিত মাত্র ১৮.৪ সেকেন্ড। এমন দ্রুতগতি ইলেকট্রনের সাথে সংযুক্ত তরঙ্গের কম্পাঙ্কও অত্যন্ত বেশি। ফলে তার সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করতে, তার ছবি তুলতে এমন প্রযুক্তি দরকার যা সেই কম্পাঙ্কের সাথে পাল্লা দিতে পারে। ব্যাপারটা এরকম, আপনি দ্রুতগামী কোনো বস্তুর ছবি তুলতে চাইছেন অথচ ক্যামেরার শাটার স্পিড কম। ছবি তো তাহলে ঝাপসা হবেই।
তাহলে উপায়?

বোরের আণবিক তত্ত্ব অনুযায়ী হাইড্রোজেনের গ্রাউন্ড স্টেটে থাকা ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে একবার পাক খেতে সময় নেয় প্রায় ১৫০ অ্যাটোসেকেন্ড। এই ইলেকট্রনকে ছবিতে বেঁধে রাখতে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির স্পন্দনও হতে হবে প্রতি অ্যাটোসেকেন্ডে খুব বেশী হলেও কয়েকবার মাত্র।

অর্থাৎ দরকার, অ্যাটোসেকেন্ড পালস যা কিনা ইলেকট্রনের অন্দরমহলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মুহূর্তকেও ধরে রাখতে পারে। তারপর সেই মুহূর্তগুলোকে পরপর সাজিয়ে নিলেই তৈরি পূর্ণ চলচ্চিত্র।
আর পরীক্ষামূলক ভাবে এই প্রযুক্তি আবিষ্কারের জন্য ২০২৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুই ফরাসী বিজ্ঞানী পিয়ের অগাস্তিনি (ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), অ্যান ল'হুইলিয়র (লুন্ড ইউনিভার্সিটি, সুইডেন) এবং হাঙ্গেরিয়ান-অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ফেরেঙ্ক ক্রওস (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট অফ কোয়ান্টাম অপটিক্স, জার্মানি)। তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদার্থের মধ্যে ইলেক্ট্রন গতিবিদ্যার অধ্যয়নের জন্য আলোর অ্যাটোসেকেন্ড স্পন্দন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আলোর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত স্পন্দন যার সাহায্যে আণবিক ইলেকট্রনের গতিবিধি নজরবন্দী করা যাবে।

বিগত ২০০১ সালে, পিয়ের অগাস্তিনি মাত্র ২৫০

আলোর বেগের কাছাকাছি। পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে পারলে এই ইলেকট্রন সময় নিত মাত্র ১৮.৪ সেকেন্ড। এমন দ্রুতগতি ইলেকট্রনের সাথে সংযুক্ত তরঙ্গের কম্পাঙ্কও অত্যন্ত বেশি। ফলে তার সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করতে, তার ছবি তুলতে এমন প্রযুক্তি দরকার যা সেই কম্পাঙ্কের সাথে পাল্লা দিতে পারে। ব্যাপারটা এরকম, আপনি দ্রুতগামী কোনো বস্তুর ছবি তুলতে চাইছেন অথচ ক্যামেরার শাটার স্পিড কম। ছবি তো তাহলে ঝাপসা হবেই।
তাহলে উপায়?

বোরের আণবিক তত্ত্ব অনুযায়ী হাইড্রোজেনের গ্রাউন্ড স্টেটে থাকা ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে একবার পাক খেতে সময় নেয় প্রায় ১৫০ অ্যাটোসেকেন্ড। এই ইলেকট্রনকে ছবিতে বেঁধে রাখতে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির স্পন্দনও হতে হবে প্রতি অ্যাটোসেকেন্ডে খুব বেশী হলেও কয়েকবার মাত্র।

অর্থাৎ দরকার, অ্যাটোসেকেন্ড পালস যা কিনা ইলেকট্রনের অন্দরমহলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মুহূর্তকেও ধরে রাখতে পারে। তারপর সেই মুহূর্তগুলোকে পরপর সাজিয়ে নিলেই তৈরি পূর্ণ চলচ্চিত্র।
আর পরীক্ষামূলক ভাবে এই প্রযুক্তি আবিষ্কারের জন্য ২০২৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অ্যাটোসেকেন্ড স্থায়িত্বের আলোক স্পন্দন তৈরি করেছিলেন। প্রায় একই সময়ে, ফেরেঙ্ক ক্রউসের পরীক্ষাগুলি ৬৫০ অ্যাটোসেকেন্ড স্থায়িত্বের একক আলোক স্পন্দন তৈরি করতে পেরেছিল। ২০১৭ সালের মধ্যেই তাঁরা মাত্র ৪৩ অ্যাটোসেকেন্ডের স্পন্দন তৈরি করেন যা এযাবৎ তৈরি সবথেকে ছোট আলোকস্পন্দন।

পদার্থের অণু আসলে বিশাল এক শক্তি ভান্ডার আর সেই শক্তির ধারক বাহক ইলেকট্রন। বাস্তবে তারা কিভাবে শক্তির আদান প্রদান করে অ্যাটোসেকেন্ড পালসের সাহায্যে তা স্পষ্ট হলে সেই শক্তিকে আরও কার্যকরী ভাবে ব্যবহার করা যাবে, এটাই আপাতত আশা বিজ্ঞানী মহলের।

এ যেন এক লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো, যেখানে গল্পের কথক ক্ষুদ্র আলোকস্পন্দন আর সেই গল্পের নায়ক ইলেকট্রন।

সহ অধ্যাপিকা
ডঃ সুধীর চন্দ্র সুর ইনস্টিটিউট
অফ টেকনোলজি অ্যান্ড স্পোর্টস কমপ্লেক্স,
কলকাতা
sayaribiswas@gmail.com

স্থূলতার মাপকাঠি

রজত মুখোপাধ্যায়

স্থূলতা কি শুধুমাত্র BMI (Body Mass Index) এর সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত? না। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এটা সঠিক নির্দেশক নয়। BMI শুধু বলে দিতে পারে আপনি সুস্থ ওজনসম্পন্ন কিনা, কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ছবি দেয়না। আপনার উচ্চতা আর ওজনের পরিমাপের সাহায্যে BMI বলে আপনার ওজন খুব কম, স্বাভাবিক, খুব বেশি, নাকি আপনি স্থূল।

গত আগস্টে আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (AMA) চিকিৎসকদের স্থূলতা নির্ণয়ে শুধুমাত্র BMI - এর উপর নির্ভর করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। তাই চিকিৎসকরা জোর দিচ্ছেন যে BMI এর পাশাপাশি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যেমন রক্তচাপ, কোলেস্টেরল ও গ্লুকোজের মাত্রাও একজনের সামগ্রিক স্বাস্থ্য বুঝতে সাহায্য করে।

ভারতে স্থূলতা এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে প্রায় প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের শরীরে কিছু পরিমাণ বাড়তি চর্বি রয়েছে, বিশেষত কোমরের চারপাশে, যা দীর্ঘমেয়াদী মধুমেহ, হৃদযন্ত্র ও বৃক্কের অসুখ, ঘুমের ব্যাঘাত, যকৃতে সিরোসিসেরও কারণ হতে পারে।

BMI হল এমন একটা বিশেষ সংখ্যা যা পাওয়া যায় কেজিতে ওজনকে মিটারে উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলে। সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (CDC) অনুযায়ী BMI অতিরিক্ত দেহজ চর্বি বা ওজনকেন্দ্রিক অসুস্থতা যেমন উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল ও টাইপ ২ ডায়াবেটিস নির্ণয়ের জন্য নয়, কেননা এগুলো সবই ওজন সামলাতে ভূমিকা নেয়।

সম্প্রতি JAPI (জার্নাল অব দ্য অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজিশিয়ানস অব ইন্ডিয়া) তে প্রকাশিত এক লেখায় গবেষকদের মন্তব্য, BMI আর কোমরের পরিধি দুটোই স্থূলতাজনিত অসুখ নির্ণয়ের সহায়ক। এখানে রোগনির্ণয় আর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রোগীর মনস্তত্ত্বও বিবেচ্য বিষয়।

এডমন্টন ওবেসিটি স্টেজিং সিস্টেম (EOSS) কে স্থূলতার পরিমাপের সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। স্থূল রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারে বহুবিশেষজ্ঞপূর্ণ দল অপরিহার্য।

গবেষণাপত্রের বক্তব্যে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার একটি অ্যালগরিদমের কথা প্রস্তাবিত হয়েছে। BMI পরিমাপ হল স্থূলতার অন্যতম একটি পরিচিত পরিমাপ। এটা কিন্তু শরীরের মোট ফ্যাটের পরিমাণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয়। কেননা দুজন সমান BMI এর ব্যক্তির সম্পূর্ণ শারীরিক ফ্যাট ভিন্ন হতেই পারে।

অধিক শতাংশ ফ্যাটযুক্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে BMI মূল্যায়ন যথেষ্ট নয়, এর মানের মাত্রায় অ্যাডিপোসিটি (শতকরা দেহজ ফ্যাট) চিহ্নিতকরণের পক্ষে সংবেদনশীলতার অভাব আছে।

দেখা গেছে, ২৫ থেকে ৩২ ইগও যুক্ত ব্যক্তিরা অতিরিক্ত মোটা না হলেও তাদের অস্থিসন্ধির রোগ, শিরদাঁড়া ও শরীরের যন্ত্রণা, নড়াচড়ার অক্ষমতা, শ্বাসহীনতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যা এতটাই গভীর যে মোটা হওয়ার আগেই এর জন্য বিশেষ চিকিৎসা দ্রুত প্রয়োজন। এটা কিন্তু BMI দিয়ে জানা যাবেনা। EOSS বিপাকীয়, কার্যকরী ও মানসিক - স্থূলতার এই তিনটি দিককে স্বীকার করেছে এবং একটি সার্বিক ও সম্পূর্ণ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা উপস্থাপন করছে।

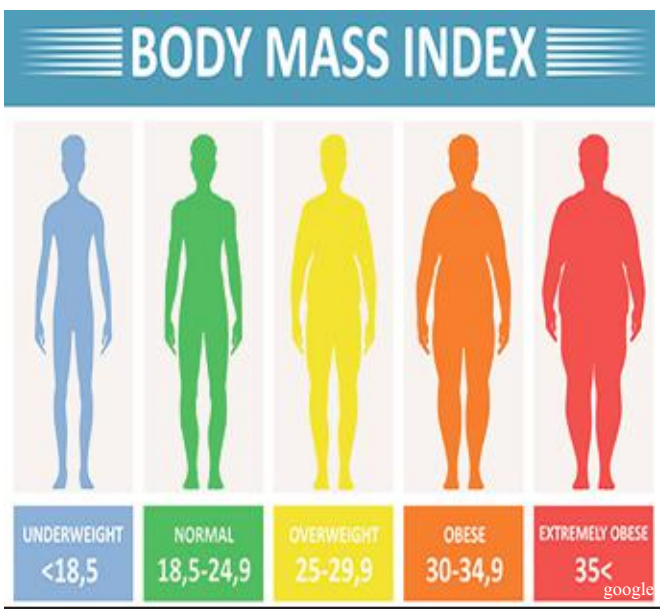

হৃদরোগবিশেষজ্ঞরা স্থূলতার গ্রেডিং এই নতুন পদ্ধতির অনুমোদন দিয়েছে যা এর চিকিৎসায় সাহায্য করবে। এতে সাবধানী কার্যকলাপ ও সময়ানুগ চিকিৎসা শুরু করা যাবে এবং ঠিক সময়ে স্থূলতায় নতুন ওষুধগুলির প্রয়োগের সুযোগ মিলবে।

mukherjeerajat1971@gmail.com

বয়ঃসন্ধির খাদ্যাভ্যাস

শ্রাবন্তী পাঠক

বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের যে যথাযথ খাবার খাওয়া উচিৎ, এবং স্কুল যে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, তা বিভিন্ন রাষ্ট্র বহুদিন উপলব্ধি করেছে। ভারতের ক্ষেত্রে যেমন প্রথমে ১৯৯৫ সালে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, ২০১৩ সালে এসে তা জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় আসে, অর্থাৎ যাকে বর্তমানে আমরা মিড-ডে মিল প্রকল্প নামে জানি। সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল এবং মাদ্রাসাগুলোতে বছরে কমপক্ষে ২০০ দিন, প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া ও তাদের স্বাস্থ্যরক্ষা মূলত এর উদ্দেশ্য। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর জন্য মাথাপিছু অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, এবং দৈনন্দিন খাবারের তালিকায় কি থাকবে, সেই নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এশিয়ার অন্য দেশ, বিশেষত, যদি জাপানের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের পুষ্টিকর খাওয়ার অভ্যাস তৈরি করা নিয়ে তারা অত্যন্ত সচেতন। সেক্ষেত্রে চিরাচরিত প্রথাগত খাবার যেমন দেওয়া হয়, ঠিক তেমনই তার পুষ্টির মাত্রার দিকেও রাষ্ট্র এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে নজর রাখা হয়। আমেরিকার বিভিন্ন স্কুলের ক্ষেত্রেও এই ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয় ১৯৪৬ থেকে, হ্যারি ট্রুম্যানের হাত ধরে।

পরবর্তীকালে এর নানান পরিবর্তন ও পরিমার্জন হলেও মূল যে উদ্যোগ অর্থাৎ নির্দিষ্ট আর্থিক মাপকাঠির নিচে বসবাস করছে যেসব পরিবার, মূলত সেইসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের যাতে খাবারে ও পুষ্টিতে ঘাটতি না হয়, সেই বিষয়টির দিকে নজর রাখা।

কিন্তু এই যে স্কুলে খাবারের ব্যবস্থা রাখার উদ্যোগ, বিশেষত, ভারতের ক্ষেত্রে, তা নিশ্চিতভাবেই হঠাৎ করে তৈরি হওয়া কোন ঘটনা নয়। ১৯২৫ সালে মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যালিটির উদ্যোগে ভারতে এরকম খাদ্য প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। বলাই বাহুল্য এই উদ্যোগে ঔপনিবেশিক সরকারের ভূমিকা ছিল।

বাংলার দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখব ১৯০০ সাল নাগাদ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ও অন্যান্য বেশকিছু পত্রপত্রিকা ছেলেমেয়েদের খাবার ও পুষ্টির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। একশো বছরের বেশি আগে, এমনকি যে সময় প্লেগের মত মহামারির আক্রমণে চারিদিকের অবস্থা টালমাটাল, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্য মনে করিয়ে দিচ্ছে পরীক্ষায় 'পাস করা অল্প সময়ে প্রয়োজন বটে; কিন্তু মানসিক শিক্ষা, যাহা লইয়া জীবনের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, তাহা এই অল্পকাল মধ্যে আবদ্ধ নয়। সুতরাং দেখিবেন যেন বিদ্যাশিক্ষার খাতিরে পক্ষপাতি হইয়া হড়াহুড়ি বা তাড়াতাড়ি করিয়া ছেলেদের শারীরিক গঠন বিষয়ে অবহেলা না হয়'।

লক্ষণীয় যে ছেলেমেয়ে উভয়ের স্বাস্থ্য নিয়েই কথা বলা হচ্ছে এবং বাবা মায়েরা তাদের পড়াশোনার দিকে মন দিতে গিয়ে যে অনেক সময়েই খাদ্যাভ্যাস বা আরও নানান বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়না, সেই দিকটা নিয়েও কথা বলা হচ্ছে। কোন খাবারের কতটা কি পুষ্টি সেই নিয়ে আলোচনার সময় এখানে ইংলন্ডের স্কুলে ছেলেরা কি ধরনের খাদ্যাভাস মেনে চলে তার তালিকাও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের বাড়বৃদ্ধি যে ভিন্ন হয়, সে ব্যাপারেও সচেতন করার চেষ্টা করছে, কারণ সেক্ষেত্রে খাদ্যাভাসেও তফাৎ হবে।

আসলে ইতিহাসের পাতায় যেমন পক্ষপাতের গল্প লুকিয়ে থাকে অনেক, ঠিক সেভাবেই তোলা থাকে শিক্ষা। সময় ও সভ্যতার অবস্থানের নিরিখে বিচার করতে বসা হলেও মানবসভ্যতা আদতে আভ্যন্তরীণ বহু বৈশিষ্ট্য সঙ্গে নিয়েই চলে। সেক্ষেত্রে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন, বা পরিমার্জন হলেও কিছু বিষয় চিরকালীন। যে কৈশোর পেরোতে চলা হাতে সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তার

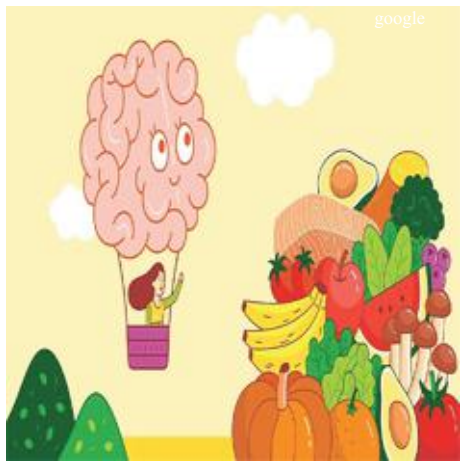

স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আর্থিক তারতম্যের কারণে স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রেটিতেও অবশ্যম্ভাবী তারতম্য বজায় রয়ে গেছে।

দেশের উন্নতি যে দেশবাসীর স্বাস্থ্যকে বাদ দিয়ে হতে পারে, তা নিশ্চিতভাবেই অজানা নয়। কিন্তু উপনিবেশের খাঁচার মধ্যে বাস করেও বাঙলার শিক্ষিত সমাজ, তথা বহু ভারতীয়রা (ঔপনিবেশিক সরকারের উদ্যোগের কথাও অস্বীকার করা যাবে না) এক্ষেত্রে যে সচেতনতার কথা ভাবতে শুরু করেছিল, তা নতুন করে তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধহয় আজও রয়ে গেছে।

পি এইচ.ডি. গবেষক
ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
pathakshravasti@gmail.com

তামাকের ইতিহাস ও অপকারিতা

শুভঙ্কর কুণ্ডু

১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যখন কলম্বাস কিউবা দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তখন তিনি দুজন নাবিককে সেই দ্বীপ পরিদর্শনের জন্য পাঠালে, তাঁরা ফিরে এসে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল, 'তথাকার অধিবাসীরা প্রজ্জ্বলিত যষ্টি খণ্ড সঙ্গে করিয়া বেড়ায় এবং মুখ ও নাসিকা হইতে ধূম নির্গত করে'। তামাকের সেবন এই প্রথম জানা গেছিল।

আদিবাসীদের হাত ধরে এই জঘন্য রীতি প্রচলিত হয়েছিল বলে তামাক সেবন অপরাধ গণ্য কাজ বলে বিবেচনা করা হত। রোমের প্রধান পোপ দ্বাদশ ইনসেন্ট আদেশ দিয়েছিলেন, 'যে ব্যক্তি উপাসনা মন্দিরে তামাক চব্বন বা ধূমপান ব্যবহার করিবেন, তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে'। যদিও পরবর্তীকালে পোপ বেনিডিক্ট নিজে ধূমপানের প্রতি আসক্ত হলে, তিনি এই দণ্ডবিধি ত্যাগ করেন। সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, পারস্যেও তামাক সেবন অপরাধের জন্য রাজদণ্ডের নির্দেশ জারি ছিল। ইংল্যান্ডের প্রথম জেমসের অনুকরণে আমেরিকাতেও এই অপরাধের জন্য আইন চালু করা হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতে তামাকের প্রচলন ছিলনা। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে ভাঙ, সুরা প্রভৃতির উল্লেখ থাকলেও তামাকের উল্লেখ কোথাও দেখা যায়না। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিদের গ্রন্থেও তামাকের উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে প্রথম ঈশ্বর গুপ্তের বইতে তামাকের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ভারত ইতিহাসে যাকে আমরা মধ্যযুগ বা মুসলিমদের রাজত্বকাল বলে থাকি, তার শেষ দিক থেকেই তামাকের প্রচলন শুরু হয়েছিল।

তামাকের পাতা থেকে যে তৈলাক্ত নির্যাস বের হয় তাকে নিকোটিন বলে। প্রতি পাউন্ড তামাকের পাতায় ৩৮০ গ্রেণ নিকোটিন পাওয়া যায়। এই নিকোটিন আত্মহত্যার জন্য ব্যবহার করা হয়। তামাক সেবনের ফলে গলায় ঘা, যক্ষ্মা, হৃদপিণ্ডের অসুখ, অন্ধ, স্নায়ুর নানান রোগ এবং ক্যান্সার রোগ হয়ে থাকে। সাপ মারার জন্য তামাকের তেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন অতিরিক্ত শ্রমের পর যখন মাথা ও স্নায়ু দুর্বল হয়, তখন তামাক সেবন করলে মাথা ঠাণ্ডা এবং ঘুম ভালো হয়।

কিন্তু, এই মতটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তামাক সেবন করলে বরং এর উল্টোটাই হয়ে থাকে। স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ডা. এল জি আলেকজান্ডার বলেছেন, 'স্নায়ু দুর্বল ব্যক্তি, স্নায়ুর ব্যথা, নানাপ্রকার স্নায়ু পীড়ার সংখ্যা সম্প্রতি এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে এ সম্বন্ধে সাধারণের মনঃসংযোগ করা আবশ্যক। তামাক ও সুরার বহুল ব্যবহারই এই স্নায়ুরোগের প্রধান কারণ'। তামাক সেবনের ফলে অপটিক স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে দৃষ্টি হ্রাস হতে হতে দৃষ্টিহীন হয়ে পরে অনেকে। চক্ষু চিকিৎসকরা এই রোগকে টোব্যাকো এমোরসিস বা তামাকজনিত অন্ধত্ব বলে থাকেন। একসময় আয়ারল্যান্ডে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সবথেকে বেশি ছিল।

বর্তমানে বাজারে যে তামাক বিক্রি হয় তা শরীরের পক্ষে আরও বেশি ক্ষতিকারক। কারণ তামাকের সঙ্গে সঙ্গে এতে চটছেঁড়া, পেপের পাতা ইত্যাদি আরও অনেক পদার্থ মিশিয়ে দেওয়া হয়। সুগন্ধি ও মিষ্টতা আনার জন্য কাঁঠালের রস, শিলারস প্রভৃতি মিশিয়ে দেওয়ায় তামাক সেবনের অপকারিতা আরও বেড়ে গেছে।

ছাত্র, ইসনা ও এম.ফিল গবেষক
ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
shubhankar1996@gmail.com

এক 'অডিসিয়াস' অবতরণ

অভিষেক দত্ত

চাঁদের মাটিতে সফল অবতরণ করেছে 'অডিসিয়াস'। ফেব্রুয়ারি মাসের ২২ তারিখ এই ঐতিহাসিক অবতরণ ঘটে। চাঁদের মাটিতে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষনের জন্য 'ল্যানডার' বা 'রোভার' পাঠানো নতুন কিছুই নয়।

তবে এই ঘটনা ঐতিহাসিক কেন? অডিসিয়াস এর এই অবতরণ হল প্রথম বেসরকারি চন্দ্রাবতরণ। Intuitive Machines নামক বেসরকারি সংস্থার দ্বারা নির্মিত এই লুনার ল্যানডার। তাছাড়া পুরো অভিযানের পরিচালনা করেছে এই কোম্পানি। এই সংস্থা বিভিন্ন সংগঠনের জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। অডিসিয়াস যে তথ্য সংগ্রহ করবে তার প্রধান গ্রাহক নাসা(NASA).

সারা বিশ্বেই মহাকাশ নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই আবহে অডিসিয়াস এর সফল অবতরণ একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

স্টিফেন আল্টেমাস, কাম ঘাফারিয়ান ও টিম ক্রেন-এর যৌথ উদ্যোগে ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় Intuitive Machines কোম্পানির। এর প্রধান কার্যালয় আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যের হিউস্টন শহরে। এর আগে এই সংগঠন ড্রোন, মহাকাশযান, লুনার ল্যানডার এবং অন্যান্য মহাকাশ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি বানিয়েছে।

২০১৮ সালে নাসা ৯টি কোম্পানিকে তাদের Commercial Lunar Payload Services (CLPS) প্রজেক্ট এর জন্য বেছে নেয়। এই ৯টি কোম্পানির মধ্যে ছিল Intuitive Machines. এই প্রজেক্ট এর জন্য নাসার কাছ থেকে প্রায় ৮ কোটি মার্কিন ডলার সাহায্য পায় এই সংস্থা।

১৯৭২ সালের Apollo ১৭-এর অভিযানের পর এই প্রথম কোনো মার্কিন লুনার ল্যানডার চাঁদের মাটিতে পৌঁছালো। অডিসিয়াস পৃথিবী ছেড়ে চাঁদের দিকে পাড়ি দেয় ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখ।

আরেকটি বেসরকারি সংস্থা স্পেস এক্স এর রকেট এটিকে চাঁদের কক্ষপথে নিয়ে যায়। অডিসিয়াস এর আয়তন একটা ফোন বুথের থেকে সামান্য বড়। সাত দিন পরে অডিসিয়াস চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করে।

অবতরণ অবশ্য সমস্যা ছাড়া হয়নি। অবতরণ এর সময় ল্যানডারটি কোনোভাবে একদিকে হেলে পড়েছে।

Intuitive Machines এর CEO স্টিফেন আল্টেমাস জানিয়েছেন যে যদিও অডিসিয়াস একদিকে হেলে গেছে, এখনও পৃথিবীর সাথে সংযোগ রয়েছে এবং সব পর্যবেক্ষনের যন্ত্রপাতিও কাজ করছে। অডিসিয়াস-এর সোলার চার্জার ও ল্যানডারটিকে চার্জ করে চলেছে।

অভিযান এর পরবর্তী অংশ কতটা সফল হয়ে তা সময় বলবে। তবে চাঁদের বুকে কোনো বেসরকারি সংস্থার এই সফল অভিযান জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে এক অতি গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায় সেই নিয়ে কোনো সংশয় নেই।

ইসনা ছাত্র ও
পি এইচ.ডি. গবেষক
ইতিহাস বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
abhishekdatta1892@gmail.com

মৌমাছি ও ঔষধি গাছ

সৈকত কুমার বসু

প্রাকৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক কারণে বিশ্বজুড়ে মৌমাছি উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। কৃষিতে বিষাক্ত কীটনাশকের নির্বিচার ব্যবহার; সেইসাথে দ্রুত পরিবেশ দূষণ, মৌমাছির জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাসে অবদান রাখছে। মৌমাছির মৃত্যু মানে আমাদের কৃষি ও বন সম্পদ ধ্বংস; যার ফলে খাদ্য নিরাপত্তা এবং আমাদের বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা প্রভাবিত হয়।

এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত ফুলের উদ্ভিদের ৮৫% পরাগায়নের জন্য মৌমাছির উপর নির্ভরশীল।

একইভাবে অতিরিক্ত শোষণের কারণে ঔষধি গাছও বিপন্ন হয়ে পড়ছে। সারা বিশ্বে ওষুধ, নিউট্রাসিউটিক্যাল এবং কার্যকরী খাদ্য শিল্পে ঔষধি গাছের উচ্চ চাহিদার ফলে স্থানীয় বন থেকে ঔষধি গাছের অতিরিক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। ফলে অনেক ঔষধি গাছ বিলুপ্তির পথে।

তাই সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে মৌমাছি ও ঔষধি গাছ রক্ষা ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। আমরা যদি তাদের রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদী কোনো উপযুক্ত উদ্যোগ না নিই, এই মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ হারালে আমরা বিপদে পড়ব।

গ্রামীণ নারীদের বিকল্প পেশা হিসেবে মৌমাছি পালন এবং ঔষধি গাছ বাগান উভয়ই করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। গ্রামীণ মহিলারা সহজেই বাড়ির উঠোন বা সংলগ্ন এলাকায় ঔষধি গাছের বাগান স্থাপন করতে পারে য ঔষধি গাছের বাগান গড়ে ওঠা এবং গাছে ফুল ফোটা শুরু হওয়ার সাথে সাথে মৌমাছি পালনের কাজে সহায়তা করার জন্য এই বাগানগুলিতে মৌমাছির বাক্স স্থাপন করা যেতে পারে। এইভাবে খুব সহজেই মৌমাছি-ওষধি উদ্ভিদ সমন্বিত বাসস্থান ব্যবস্থা একটি জৈব প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ষ সম্ভবত এই প্রথম সীমান্তে 'বি কেজ' তৈরি করে 'জৈব প্রতিরক্ষা' ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে বিএসএফ। নদিয়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। ওই গোটা এলাকা জুড়েই এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছে বিএসএফ।

ইতিমধ্যেই নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের কাঁদিপুর অংশে কাঁটাতারের পাশে মৌমাছিদের চাষ শুরু হয়েছে। সীমান্ত লাগোয়া অংশে বসানো হয়েছে মৌমাছির খাঁচা। কাঁটাতার নড়ে উঠলেই খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসবে মৌমাছিরা, আক্রমণ করবে অনুপ্রবেশকারী কিংবা চোরাচালানকারীদের উপর। কাঁটাতার বরাবর বিভিন্ন ঔষধি গাছের চাষের পরিকল্পনা নিচ্ছে বিএসএফ। বিভিন্ন ঔষধি গাছের চাষ করে স্থানীয়দের কর্মসংস্থান করা যাবে। ঔষধি গাছের চাষ শুরু হচ্ছে সীমান্তে । সফল হলে বড় এলাকা জুড়ে এই ব্যবস্থা কার্যকর করা যাবে।

বিজ্ঞানী
লেথব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়,
কানাডা
saikat.basu@alumni.uleth.ca

পেট্রি ডিশ

সৌমিত্র চৌধুরী

এমন নাম কেন? ডিশ মানে তো বুঝতে পারি, প্লেট কিংবা থালা। 'পেট্রি ডিশ' আবার কোথা থেকে এল?

যেখান থেকেই আসুক, হেলা ফেলার বস্তু নয়। গবেষণাগারে ভীষণই এক কাজের জিনিষ, পেট্রি ডিশ। বিজ্ঞানের প্রায় সব বিভাগের ছাত্ররাই একে জানে। জীববিজ্ঞানের যে কোনও ল্যাবরেটরিতে পেট্রি ডিশ থাকবেই। আধুনিক রোগ বিজ্ঞান, ওষুধ বিজ্ঞান, জেনেটিক্সের গবেষণায় একে পাওয়া যাবে। পেট্রি ডিশ বিনা আধুনিক জীবনযাত্রা অচল। চিকিৎসা-গবেষণা, অণুজীববিজ্ঞান, কোষ নিয়ে গবেষণা থমকে যাবে। জীববিজ্ঞানের গবেষণায় অবিচ্ছেদ্য উপকরণ পেট্রি ডিশ। জিনিসটি অন্য নামে পেট্রি প্লেট। এর বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ডিশ বা প্লেটের বাংলা হিসাবে 'থালা বা রেকাবি' আছে। কিন্তু পেট্রি ডিশের পরিবর্তে বাংলায় 'পেট্রি থালা' একদমই বেমানান। তাই পেট্রি ডিশ নামেই একে গ্রহণ করি। আর ডিশ বা প্লেট বাংলা অভিধানে ঢুকেই পড়েছে। যাই হোক, এখনও বলা হল না, পেট্রি শব্দেরই বা অর্থ কি!

তার আগে বলা উচিৎ, কেন পেট্রি ডিশ নিয়ে আলোচনা? আলোচনা প্রয়োজন, কারণ বিজ্ঞানের আমূল পরিবর্তন হয়েছে গত একশ বছরে কিন্তু পেট্রি ডিশ রয়ে গেল একই রকম। ব্যবহার হয়ে চলছে হালের বিজ্ঞানে, অতি আধুনিক আবিষ্কারের কাজেও। ভ্যাক্সিন তৈরি, ওষুধ আবিষ্কার, ইনসুলিন জোগান দেওয়া ইত্যাদি হাজার রকম কর্মকাণ্ডে। ব্যবহার হচ্ছে সদ্য গজিয়ে ওঠা কোনো রোগের ওষুধ অন্বেষণেও। এমনকি ভয়ংকর সব মারণ রোগের ভ্যাকসিন তৈরির কাজেও।

কালের নিয়মে বহু পরিবর্তন এসেছে বিজ্ঞানের আঙিনায়। আমূল অদলে গেছে ওষুধ গবেষণা তথা অনুজীববিদ্যার পূর্ব-ধারণা। বহু

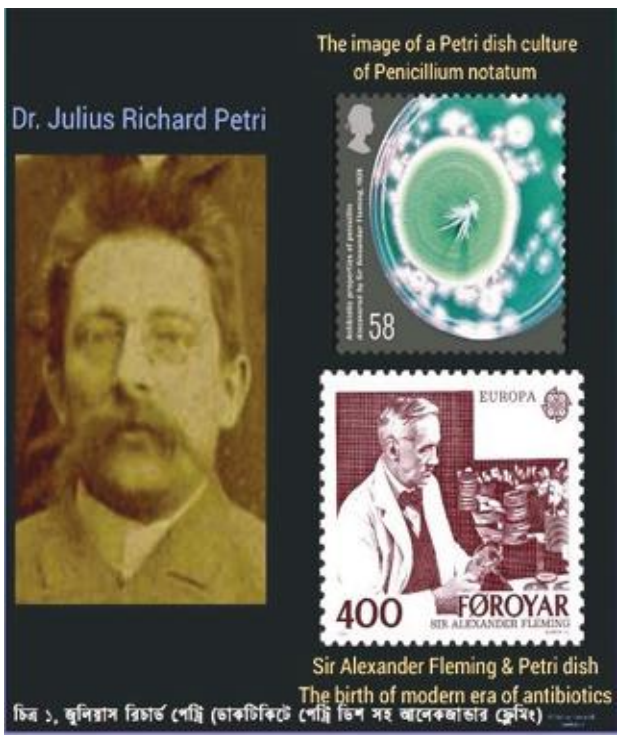

চিত্র ১, জুলিয়াস রিচার্ড পেট্রি (ডাকটিকিটে পেট্রি ডিশ সহ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং)

আবিষ্কারে অতি দ্রুত সমৃদ্ধ হয়েছে বিজ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণাগারে পেট্রি ডিশ রয়ে গেল প্রায় একই রকম। তেমন কোনও পরিবর্তন হল না জিনিষটার।

কেমন জিনিষ পেট্রি ডিশ? বলা হয়েছে আগেই, গবেষণার অবিচ্ছেদ্য উপকরণ। আদতে কাঁচ বা প্লাস্টিকের ছোট এক জোড়া প্লেট। ফ্ল্যাট, অগভীর, ছোট্ট ডিশ। ডিশের উপর ঢাকনা দেওয়া। পেট্রি ডিশে ব্যাকটেরিয়া বা অন্য ধরণের কোষ প্রতিপালন (কর্ষণ, culture) করা হয়। অর্থাৎ পেট্রি ডিশে কোষগুলি বৃদ্ধি পায়, মানে সংখ্যায় বাড়তে থাকে। আর এই বৃদ্ধির জন্য দেওয়া হয় কোষের উপযুক্ত খাদ্য (neutrient)। দরকার হয় পরিবেশের সঠিক তাপমাত্রা এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমান বজায় রাখা। আর দরকার পরিবেশ জীবাণু মুক্ত রাখা। নইলে অন্য জীবাণু আক্রমণ হানতে পারে পেট্রি ডিশের নির্দিষ্ট কোষে।

সব মিলিয়ে বহু কাজের প্রয়োজনে কোষ কালচার করা হয় পেট্রি ডিশে। কাঁচ বা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি পেট্রি ডিশ, বলা হয়েছে। কাঁচের পেট্রি ডিশ ধুয়ে নিয়ে ব্যবহার করা যায় আর প্লাস্টিকের পেট্রি ডিশ? একবার ব্যবহার করেই ফেলে দিতে হয়। বেশীরভাগ পেট্রি প্লেট আকারে গোল, ৩০ মিলিমিটার ব্যাস। অবশ্য বড় আকারেরও হয়, ব্যাস ২০০ মিমি পর্যন্ত। বিশেষ কাজের প্রয়োজনে বর্গাকার পেট্রি ডিশ কখনও ব্যবহার হয়।

কে আবিষ্কার করল, কেন প্রয়োজন ঘটল? এখানেই মিলবে আগের প্রশ্নের উত্তর, 'পেট্রি' কথার মানে। পেট্রি ডিশ আবিষ্কার করেছিলেন জার্মান দেশের বিজ্ঞানী, ডাক্তার জুলিয়াস রিচার্ড পেট্রি (Julius Richard Petri, ১৮৫২-১৯২১)। কে তিনি? তিনি ডাক্তার, বার্লিন শহরে রবার্ট কখের (Robert Koch, ১৮৪৩-১৯১০) অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করতেন। রবার্ট কখ ব্যস্ত ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক। ব্যাকটেরিয়া সহ বহু বিষয় নিয়ে গবেষণা তাঁর। টিবি রোগের (tuberculosisbacterium) কারণ আবিষ্কার করে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন (১৯০৫) সালে। তাঁর অধীনেই গবেষণায় যোগ দিয়েছিলেন ডাক্তার পেট্রি।

জুলিয়াস রিচারড পেট্রি (চিত্র ১) নিজের চেষ্টায় ব্যক্তিগত গবেষণাগারেই তৈরি করে ফেললেন (১৮৮১) বিশেষ ধরণের ডিশ। একটি ছোট আরেকটি সামান্য বড়। বড়টি ঢাকনা, এর ফাঁক দিয়ে হাওয়া চলাচল করতে পারে। জিনিসটির নামকরণ হল আবিষ্কারকের নামেই। সুবিধার জন্য গবেষণার বহু বিভাগই গ্রহণ করল পেট্রি ডিশ। এর বিশেষত্ব হল, স্বচ্ছ ঢাকনার উপর দিয়ে ভিতরের জিনিষ দেখতে পাওয়া যায়।

পেট্রি ডিশ ব্যবহার করেই আবিষ্কার হয়েছিল প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক, পেনিসিলিন (১৯২৯)। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং লক্ষ করলেন পেনিসিলিয়াম মোল্ড (penicillium mold), এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া কালচারকে দুষিত (contaminate) করেছে। এর ফলে ব্যাকটেরিয়া মরে যাচ্ছে। তার মানে, পেনিসিলিয়াম মোল্ডেই আছে জীবাণু (ব্যাক্টেরিয়া) মারার ওষুধ। এই পর্যবেক্ষণ থেকেই আবিষ্কার হল পেনিসিলিন।

পেট্রি ডিশ আবিষ্কারের আগে জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) কালচার করা হত টেস্টটিউব কিংবা কাঁচের বোতলে। বিজ্ঞানী রবার্ট কখ এগুলো দিয়েই ব্যাকটেরিয়া কালচার করতেন। এই ধরণের ব্যবস্থায় বেশ কিছু অসুবিধা ছিল। বোতলের মুখ খুলে ভিতরের জীবাণুর অবস্থা দেখতে হত। ফলে খুব সহজেই সেগুলোর মধ্যে বাতাসের ধুলো বা অন্য জীবাণু ঢুকে পড়ত।

কী করে অসুবিধা দূর করা যায়? ভাবতে বসলেন বিজ্ঞানী কখের সহকর্মী ডাক্তার পেট্রি। খুব অল্প সময়ে আবিষ্কার করে ফেললেন বিশেষ ধরনের প্লেট। বিজ্ঞান পত্রিকায় যাবতীয় তথ্য উল্লেখ করে ডাক্তার পেট্রি প্রকাশ করলেন তাঁর আবিষ্কার (A small modification of Koch's plate method)। জার্মান ভাষায় বললে, 'Eine kleine Modification des Kochschen Platten Verfahrens'।

এর পরেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল পেট্রি ডিশ। বহু ধরণের গবেষণার কাজে ব্যবহার হতে লাগলো। ব্যাকটেরিয়া কালচার, অ্যান্টিব্যায়োটিক ওষুধের কার্যকারিতা ইত্যাদি। অণুজীব বিজ্ঞানের গবেষণায় অপরিহার্য উপাদান হিসাবে চিহ্নিত হল পেট্রি ডিশ (চিত্র ২)।

পেট্রি ডিশ আবিষ্কৃত হল ১৮৮৭ সালে। একে কাজে লাগিয়ে তৈরি হল পেনিসিলিন (১৯২৯)। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং-এর হাত দিয়ে সূচনা ঘটল প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের (চিত্র ১)।

শুধু ব্যাক্টেরিয়া নয়, মানুষ কিংবা অন্য প্রাণীর জীবিত কোষ নিয়ে কালচার শুরু হল পেট্রি ডিশে (চিত্র ৩)।

ব্যাক্টেরিয়া কালচারে নিউট্রিয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয় অ্যাগার (agar, এক ধরণের পলিস্যকারাইড) আর প্রাণীর কোষ কালচারে কোষের খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয় সিরাম (serum, রক্ত জমাট বাঁধবার পর পড়ে থাকা তরল অংশ)।

সহজ পদ্ধতিতে মানুষের কোষ কালচার শুরু হতেই ওষুধ গবেষণা নতুন এক মাত্রা লাভ করল। কালক্রমে জিন সংক্রান্ত গবেষণায় পেট্রি ডিশ ব্যবহার হতে শুরু করল। এখনকার পেট্রি ডিশ তৈরি পলিস্টাইরিন দিয়ে। পলিস্টাইরিন স্বচ্ছ পলিমার। এর মধ্য দিয়ে কোষের স্বাস্থ্য দেখে নেওয়া যায়। ছবিও তুলে রাখা যায়। পেট্রি ডিশের ছোট প্লেটের নীচে এক ধরণের আঠা লাগানো থাকে। প্রোটিন (কোলাজেন, ফাইব্রোনেকটিন) দিয়ে তৈরি এক ধরনের হালকা আঠা। এদের কাজ কোষকে পেট্রি ডিশে আটকে (ahesion) রাখা। অবশ্য আরও অনেক গুণাবলীও থাকে। বিভিন্ন মাপে তৈরি হয় পেট্রি ডিশ, ৩৫সস, ৫০সস, ৭০ সস ইত্যাদি। তৈরি হবার পেট্রি ডিশকে গামা রেডিয়েশন দিয়ে জীবাণু মুক্ত করা হয়।

পেট্রি ডিশের আবিষ্কারক ডাক্তার পেট্রি সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলা আবশ্যক। জার্মানির বারমেন শহরে জন্ম (১৮৫২)। ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছে, বড় হয়ে ডাক্তার হবেন। স্কুল পাঠ শেষ করে তাই ভর্তি হলেন কাইসার অ্যাকাদেমিতে (Kaiser Wilhelm-Akademie for military physicians)। পড়াশোনা করলেন পাঁচ বছর (১৮৭১ ঃড় ১৮৭৫)। তারপর গবেষণা করে অর্জন করলেন ডক্টরেট ডিগ্রী (১৮৭৬)। জার্মানির মিলিটারি অকাডেমি থেকে ডাক্তারি পাশ করে ডাক্তার হিসাবে সেখানেই কাজে যোগ দিয়েছিলেন (১৮৭৬ - ১৮৮২)। চাকরির সময়কালে গবেষণার কিছু কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন বার্লিনে বিজ্ঞানী কখের সঙ্গে কাজ করবার দুর্লভ সুযোগ। কখের ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করবার সময়েই ব্যাক্টেরিয়া সম্পর্কে আগ্রহ জন্মেছিল। আর এখানেই উদ্ভাবন করেন কোষ কালচারের অনবদ্য উপাদান, পেট্রি ডিশ। কখকে দেখান তাঁর আবিষ্কার। বিজ্ঞানী কখের গবেষণায় সহায়ক হয়েছিল পেট্রির তৈরি কালচার ডিশ।

পেট্রির আবিষ্কারের আগে কী ভাবে হত ব্যাকটেরিয়া কালচার? তরল পদার্থের সুপের মধ্যে (liquid broth) কালচার করা হত ব্যাকটেরিয়া।

চিত্র ৩, পেট্রি ডিশে মানুষের কোষ নিয়ে গবেষণা

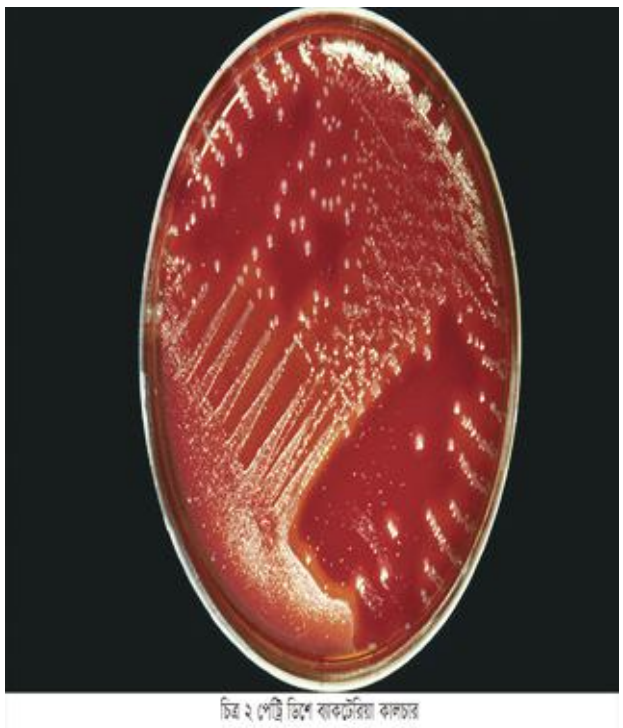

চিত্র ২ পেট্রি ডিশে ব্যাকটেরিয়া কালচার

ব্যাকটেরিয়া কলোনি তৈরি করে বাড়তে থাকে। তরল মিডিয়াতে সেগুলো দেখার সুযোগ নেই। ডাক্তার কখ ভাবতেন কোনও ভাবে কঠিন মিডিয়াতে ব্যাকটেরিয়া কালচার করা যায় কিনা।

পেট্রি অনুমান করেছিলেন, গলানো অ্যাগার (molten agar) নীচের প্লেটে রাখলে তার উপর জন্মাবে ব্যাকটেরিয়া। পেট্রি প্লেটের উপরে থাকবে আরেকটি ঢাকনা। কাজে সফল হয়েছিলেন ডাক্তার পেট্রি। পেট্রি ডিশ তাঁর অনবদ্য আবিষ্কার। ডাক্তার কখের ল্যাবোরেটরিতে কাজ শেষ করবার পরেও ব্যাক্টেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণা চালিয়ে যান ডাক্তার পেট্রি। টিবি রুগীদের চিকিৎসা করতেন, স্যানাটোরিয়াম চালাতেন তিনি। পরে স্বাস্থ্য বিভাগের (Museum of Hygiene in Berlin) ডিরেক্টর পদেরও দায়িত্ব সামলেছিলেন। বহু রকম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দেড়শ গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন ডাক্তার পেট্রি।

উন্নত গবেষণা, বিভিন্ন রোগের ওষুধ অন্বেষণ ইত্যাদি কাজে দুনিয়া ব্যাপী পেট্রি ডিশের ব্যাপক চাহিদা। ষোল কোটি ডলারের বর্তমান বাজার। ইউরোপ আমেরিকার বহু কোম্পানি তৈরি করে পেট্রি ডিশ। ভারতের গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের কয়েকটি কোম্পানিও দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদন করছে।

পেট্রি ডিশের আবিষ্কর্তা ডাক্তার পেট্রি জার্মানির জাইজ (Zeitz) শহরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (১৯২১) প্রায় একশ দুই বছর আগে। তাঁর আবিষ্কার টিকে আছে আজও। দেড়শ বছর ধরে চলছে তাঁর আবিষ্কৃত জিনিষটির ব্যবহার। এই বছর মে মাসে তাঁর ১৭৩ তম জন্মদিন।

প্রাক্তন প্রধান বিজ্ঞানী,
চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ ইন্সটিটিউট
soumitrag10@gmail.com

কিশলয়ের অভিনয়

সৌজন্য ব্যানার্জী
প্রথম শ্রেণী, গড়িয়া বিদ্যাভবন

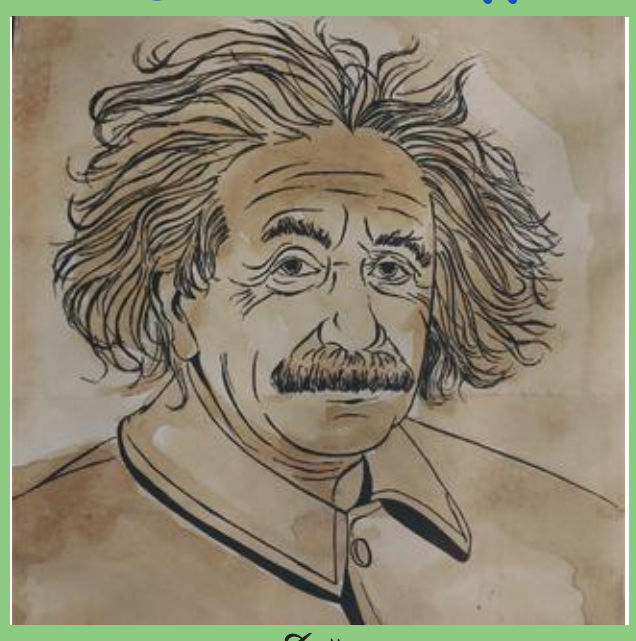

হেমর্ষি পাল
অষ্টম শ্রেণী, ভবনস্ গঙ্গাবক্স কানোরিয়া বিদ্যামন্দির

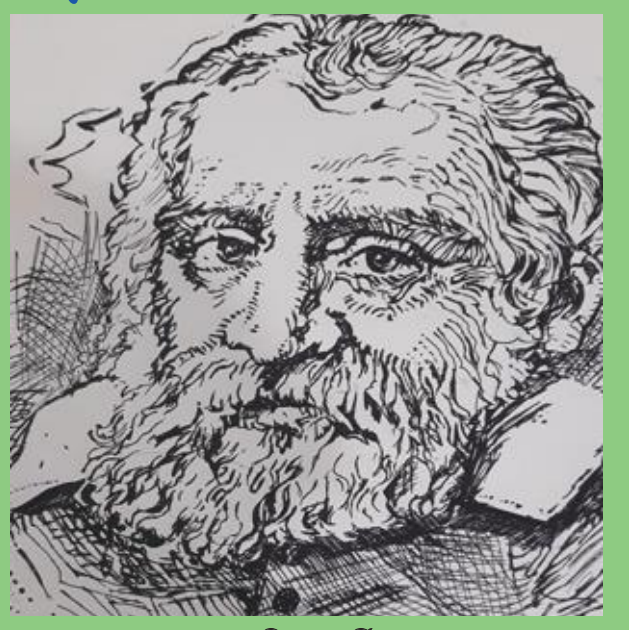

শ্রেয়সী ব্যানার্জী,
অষ্টম শ্রেণী, ভবনস্ গঙ্গাবক্স কানোরিয়া বিদ্যামন্দির

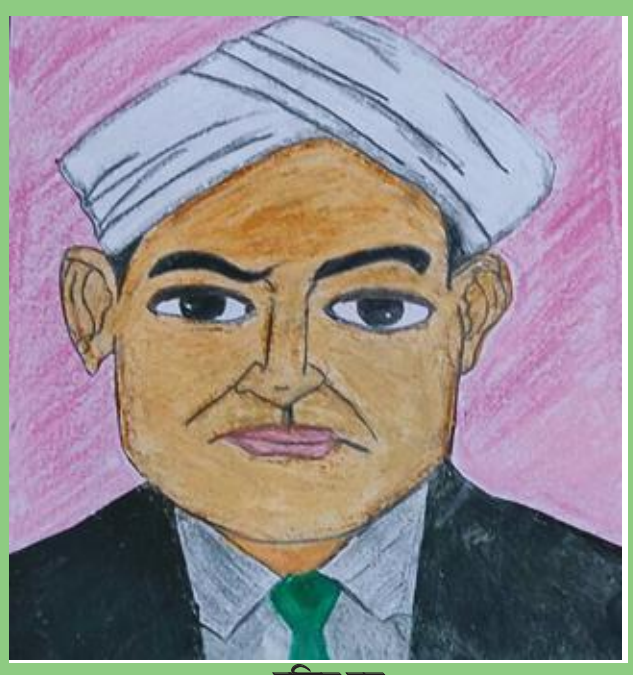

রক্তিম বসু
সপ্তম শ্রেণী, ভবনস্ গঙ্গাবক্স কানোরিয়া বিদ্যামন্দির

প্রচেতা বসু
সপ্তম শ্রেণী, ভবনস্ গঙ্গাবক্স কানোরিয়া বিদ্যামন্দির

পরিযায়ী পাখির পাঁচালী

নবীনা রায় মজুমদার

পাখির কোনো দেশ নেই। ডানায় ভর করে খোলা আকাশে উড়ে বেড়ায় তারা। খাবার আর নিরাপদ আবাসের সন্ধানে পাখি এক দেশের সীমা ছাড়িয়ে চলে যায় অন্য দেশে। প্রতিবছর দেশে শীত আসে। আর শীতের সঙ্গে আসে অসংখ্য পরিযায়ী পাখি। দূর দেশ থেকে আসে একটু আশ্রয় আর খাদ্যের আশায়। বিশেষ করে যেসব দেশে শীতের তীব্রতা খুব বেশি, খুব ঠাণ্ডায় যেখানে পাখিগুলোর টিকে থাকা কঠিন হয়ে পরে,খাবার থাকে না, বাসা বাঁধার জায়গা থাকে না সেসব দেশ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি আমাদের দেশে চলে আসে। কোনো কোনো পাখির হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস উড়তে হয়। কখনো কখনো এমন দূর থেকে আসে ওরা যে সেখান থেকে উড়ে আসতে আসতে পথে প্রায় তিন মাস সময় লেগে যায়। আবার কিছুদিন আমাদের দেশে থেকে ফিরে যায়। ফিরে যেতে আবারও তিন মাস তাদের উড়তে হয়। তার মানে কোনো কোনো পাখির বছরে ছয়মাস শুধু উড়তে উড়তেই কেটে যায়।

ভারতের মতো গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বেড়াতে যাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় নিঃসন্দেহে শীতকাল। আর যদি পরিযায়ী পাখি নিয়ে আগ্রহ থাকে, তাহলে ভ্রমনের সেরা সময় সেই নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী। এই সময় সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে আসে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের নানা প্রান্তের জলাভূমিতে। শুধু সাইবেরিয়াই নয়, ইওরোপ, রাশিয়া, চীন কিংবা তিব্বতের শীতার্ত এলাকাগুলি থেকে এই ঋতুতে নানা প্রজাতির পাখি উড়ে আসে তিনদিক সমুদ্রে ঘেরা তুলনায় উষ্ণ ভারতের মাটিতে। আবার শীত কমতে শুরু করলে তারা ফিরে যায় যার পুরোনো আস্তানায়। শীতকাল ছাড়া সারা বছর এসব পাখিদের দেখা মেলেনা বলেই এদের অতিথি পাখি বা পরিযায়ী পাখি বলা হয়। এসব পরিযায়ী পাখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হাঁস, রাজহাঁস, কালেম, ডাহুক, ছোটো সরালী, খঞ্জনা, চটক, মাঠ চড়াই, কসাই পাখি, গাঙ চিল, নীল শির, লাল শির, কালো হাঁস, লেঞ্জা হাঁস, খুদে গাঙচিল, উন্তি হাঁস, জিরিয়া, চখাচখি পাখি, বালি হাঁস, বড়ো সরালী, কালিপক, জলময়ূরী, বা ডুবুরি ইত্যাদি প্রচুর পাখি আছে যারা এই সময় আসে। আর আমাদের কলকাতায় এলেই মনে পড়ে যায় সাঁতরাগাছির সেই ঝিলের কথা। সেখানে কত ধরনের পরিযায়ী পাখি দেখা যায়। ওদের দেহে অসাধারন এক সংবেদী কৌশল আছে যা দিয়ে ওরা শত শত এমনকি হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ঠিকই আগের জায়গায় ফিরে আসতে পারে। যাত্রা পথের আকাশ, নক্ষত্র, পাহাড়, নদ নদী, অরণ্য, ইত্যাদি ওরা চিনে রাখে এবং এসবের সাহায্যে ঠিকই আবার গন্তব্যে পৌঁছে যায়। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া পাখিগুলো একটু উষ্ণতা, খাদ্য ও আশ্রয়ের আশায় আমাদের দেশের বিভিন্ন বন, জঙ্গল, হাওর, বাওর, খাল,নদী, চর, বিল, জলাশয়ে এসে জড়ো হয়। বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন এই পৃথিবীর প্রায় ১০০০০ প্রজাতির পাখির মধ্যে ১৮৫৫ সংখ্যক প্রজাতিই পরিযায়ী। অর্থাৎ তারা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় পুরোনো বাসা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে নতুন বাসা গড়ে তোলে। আবার সময় অতিক্রান্ত হলে পথ চিনে ফিরেও আসে কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ। এক দেশ থেকে অন্য দেশ, এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধ অবলীলায় উড়ে যায় এই পরিযায়ীরা।

এই শীতকালেই পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের কিছু কিছু এলাকায় অস্বাভাবিক বরফ পড়ে। কয়েক ইঞ্চি বরফের পুরো আস্তরনের তলায় ঢাকা পড়ে যায় মাটি। তাছাড়া ভীষণ শীতে বরফপাতের মধ্যে তাদের স্বাভাবিক খাবারের ভাঁড়ারেও টান পড়ে এই সময়। তুলনায় উষ্ণ একটা আস্তানা আর খাবারের খোঁজে দলে এলে পাড়ি জমায় দক্ষিণের দিকে। ওরা জানে কখন ওদের কোন দেশে আশ্রয় নিতে হবে। এজন্য আসার আগে ওরা পাখার নিচে বেশি চর্বি জমা করে রাখে। মাইলের পর মাইল ওরা উড়ে চলে সেই সঞ্চিত চর্বির শক্তিতে।

ওদের পরিযায়ী স্বভাবটাও বেশ অদ্ভুত। সাধারণত ওরা দল বেঁধে চলে। ওদের রঙবেরঙের সৌন্দর্যে শীতের দিনে রঙিণ হয়ে ওঠে আমাদের জলাশয়গুলো। সুন্দরবনের নদ নদী খাল ইত্যাদি স্থানগুলোতেও দেখা মেলে পরিযায়ী পাখিদের।

ভাবতে অবাক লাগে এই সুন্দর পরিযায়ী পাখিদের ওপর কিছু দুষ্ট মানুষের নজর পড়ে। শিকারীর দল মেতে ওঠে পরিযায়ী পাখি শিকারে। দেশে আইন থাকলেও তা উপেক্ষা করে শিকার চলে। আগে সেইসব দেশে যতটা শীত থাকতো এখন সেখানে কিছুটা উষ্ণ হয়ে ওঠায় অনেক পরিযায়ী পাখির আবাস স্থল পরিবর্তন করতে হচ্ছে। আমাদের দেশেও জলাশয়ের পরিধি ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। জলাশয়ে থাকা মাছ, শামুক, ইত্যাদি কমে যাচ্ছে। ফলে যে নিশ্চিত খাদ্য ও আশ্রয়ের আশায় পরিযায়ী পাখিগুলো আসতো ওরা এসে আর সেভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেনা। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত পরিযায়ী পাখিগুলোকে বিপদগ্রস্ত করে তুলছে।

পাখিকে বলা হয় প্রকৃতির অলঙ্কার। পাখি পোকা মাকড় খেয়ে ফসল রক্ষা করে। পাখির বিষ্ঠা থেকে জমিতে ফসলের উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। মোট কথা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পাখির রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আমাদের পাখির বন্ধু হতে হবে। খেয়ালও রাখতে হবে পৃথিবীর এই সৌন্দর্য্যময় প্রাণীকে আমরা যাতে হারিয়ে না ফেলি। চোরা শিকারীদের হাত থেকে আমাদেরকেই তাদের রক্ষা করতে হবে। নিজেদের আনন্দের জন্য - আনন্দ বললে ভুল হবে ক্ষনিক আনন্দের জন্য - তাদের ব্যবহার না করে তাদেরকে শিকার না করে বরং আসুন তাদের দুহাত মেলে স্বাগত জানাই।

সংযোজিকা,
রেডিও কলকাতা
radiokolkata.org

জৈব কৃষি

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের ভাবনা

সুদীপ মণ্ডল

সারা পৃথিবীতে জৈব কৃষি একটি নতুন ধারণা হিসেবে ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। কিন্তু ভারতে জৈব কৃষির চিন্তার ইতিহাস অনেক পুরোনো। ভারতীয় দর্শন ভোগবাদের বিপরীতে ত্যাগ ও সরল জীবনাদর্শকেই গুরুত্ব দিয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম পরিবেশ রক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। মহাবীরের উপদেশগুলির মধ্যে আধুনিক পরিবেশবাদের নীতিগুলির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি সরল জীবনাদর্শে বিশ্বাস করতেন। ভারতীয় দর্শনের পাশাপাশি গান্ধি উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখের উদ্যোগে শুরু হওয়া রোমান্টিক পরিবেশ আন্দোলনের অনুরাগী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ইংল্যান্ডে থাকার সময় তিনি এডওয়ার্ড কার্পেন্টার-এর Civilization, Its Cause and Cure বইটি উৎসাহের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন ও পরবর্তীতে আত্মজীবনী লেখার সময় নিজের চিন্তাভাবনার ওপরে বইটির প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

গান্ধি বিশ্বাস করতেন পশ্চিমি শিল্পায়ন কখনও ভারতের উন্নয়নের পথ হতে পারে না। তিনি চেয়েছিলেন গ্রামীণ সরল ভারতবর্ষকে। ১৯৭৩-এ শক্তি সংকটের (এনার্জি ক্রাইসিস) পরিপ্রেক্ষিতে ই. এফ. শুমাখার লেখেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Small is Beautiful: A Studz of Economics as if People Mattered। এই বই পশ্চিমি অর্থনীতির তীব্র সমালোচনা করে এবং তা পশ্চিমি দুনিয়ার প্রচলিত 'বিগার ইজ বেটার' ধারণার বদলে ক্ষুদ্র প্রযুক্তির কথা বলে। মূলত শুমাখার-এর এই বইয়ের প্রভাবেই ইউরোপে 'এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি' আন্দোলনের জন্ম হয়।

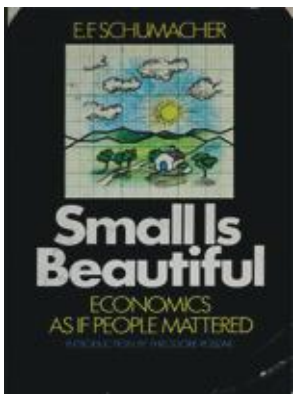

মহাত্মা গান্ধি এর বহু পূর্বেই বৃহৎ কারখানা ও বড় প্রযুক্তির বিরুদ্ধে বলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বড় প্রযুক্তি সবসময় মানুষের ক্ষমতায়নে বাধা সৃষ্টি করে এবং মুষ্টিমেয় কিছু মানুষকে লাভ দেয়, সমাজে সৃষ্টি করে বৈষম্য। তিনি ক্ষুদ্র গ্রামীণ প্রযুক্তির কথা বলতেন যা গ্রামকে স্বনির্ভর করবে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে ১৯২৫-এ তিনি 'All India Spinners Association' এবং ১৯৩৫-এ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পর 'All India Village Industries Association গঠন করেন। শুমাখার তাঁর চিন্তাভাবনা গঠনের দিক থেকে অনেকাংশেই মহাত্মা গান্ধির চিন্তার কাছে ঋণী।

গান্ধিজি কৃষির বাণিজ্যায়নের তীব্র বিরোধী ছিলেন। কৃষিতে যন্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে ট্রাক্টরের পরিবর্তে লাঙল ব্যবহার করা উচিত আর রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। যদিও সেইসময়ের রাসায়নিক সার তেমনভাবে ব্যবহার করা হত না।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের কর্ণধার নেহেরু দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পশ্চিমি উন্নয়নের মডেলকে যথার্থভাবে গ্রহণ করেছিলেন। মূলত রাশিয়ার দ্বারা তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যে রাশিয়া ছিল পশ্চাৎপদ ও কৃষিনির্ভর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সে হয়ে ওঠে পরাক্রমশালী শিল্পোন্নত দেশ। বিশেষত, জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় বিশ্ববাসীকে রাশিয়ার সামরিক শক্তি তথা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য করে।

রাশিয়ার এই দ্রুত উন্নয়ন নেহেরুকে অনুপ্রাণিত করে দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ জর্জরিত সদ্যজাত ভারত রাষ্ট্রের নির্মাণে। কর্ণধার তাই আস্থা রাখেন ভারী শিল্পায়নের ওপরেই। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে শিল্পের বিকাশের বিষয়টি।

নেহেরুর উন্নয়নের মডেলের তাৎপর্যপূর্ণ সমালোচনা এসেছিল গান্ধিবাদীদের কাছ থেকে। ভারতবর্ষের আদি পরিবেশবাদের প্রবক্তা এঁরাই। গান্ধির ঘনিষ্ঠ অনুগামী জে সি কুমারাপ্পা ও মীরা বেন (ম্যাডেলিন স্লেড) ছিলেন এই আদিপর্বের পরিবেশবাদীদের পুরোভাগে। তাঁরা পশ্চিমি ভোগবাদী উন্নয়নের মডেলকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন বিশেষত, কৃষিনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা অবিবেচনাপ্রসূত নতুন প্রযুক্তির আমদানিকে বড় ভ্রান্তি বলে অভিহিত করেন। তাঁরা বলেন বড় বড় বাঁধের চেয়ে ছোট ছোট সেচপ্রণালী অনেক বেশি কার্যকর। রাসায়নিক সার মাটির ক্ষতি করে, অপরদিকে জৈব সার অনেক বেশি কার্যকরী। এই পদ্ধতি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে মীরা বেন লিখেছিলেন, 'মানুষ তার বিজ্ঞান, তার মেশিনপত্র কাজে লাগিয়ে সাময়িকভাবে হয়তো বিপুল মুনাফা লুঠবে কিন্তু অবশেষে নেমে আসবে চরম শূন্যতা। দৈহিক সুস্থতা, নৈতিক পরিচ্ছন্নতা নিয়ে যদি আমাদের টিকে থাকতে হয় তাহলে প্রাকৃতির ভারসাম্যকে বুঝতে হবে। প্রকৃতির নিয়ম মেনেই আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে।

ইংল্যান্ডের এক অভিজাত পরিবারের সন্তান ও পরবর্তীকালে গান্ধিজির শিষ্যা মীরা বেন ছিলেন জৈব কৃষির অন্যতম প্রধান সমর্থক ও প্রচারক।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে জৈব কৃষির আরেকজন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা ছিলেন মহাত্মা গান্ধির ঘনিষ্ঠ অনুগামী ও শিষ্য বিনোবা ভাবে। গান্ধির সরল ও আড়ম্বরহীন আশ্রমিক জীবন ও অর্থনীতি-ভাবনাকে তিনি কৃষির মাধ্যমে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। ভাবে-র মতে, শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী উন্নত বিশ্বে যে কৃষি প্রচলন ঘটেছে তা প্রকৃতি ও মানুষ এই দুইয়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক। এই কৃষিপদ্ধতি সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ধারণাকে আঘাত হানছে, গড়ে তুলছে বৈষম্যের প্রাচীর।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রের পাউনারে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্ম বিদ্যামন্দির নামে স্বনির্ভর আশ্রম। আশ্রমিকদের জন্য যে খাদ্যের দরকার হত, তা আশ্রমিকরাই উৎপাদন করত। উৎপাদন পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণরূপে জৈবিক। স্বনির্ভরতা, অহিংসা ছিল গান্ধির দর্শনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে গীতার আদর্শের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তিনি কৃষিকার্যের মাধ্যমেই গীতার সিদ্ধান্তগুলির প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে অনেকেই ভাবে-র কৃষিদর্শনকে বাস্তবতাহীন-কল্পনাবিলাস বলে সমালোচনা করেছেন, তথাপি ভারতবর্ষের জৈব কৃষির দর্শন বিকাশের ক্ষেত্রে বিনোবা ভাবে-র কৃষিচিন্তার এক বিরাট অবদান রয়েছে।

তাদের লক্ষ্য ছিল দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের দিকে ভারতকে নিয়ে যাওয়া। দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য হল এমন একটি পৃথিবী তৈরি করা, যেখানে একদিকে যেমন বর্তমান মানুষের প্রয়োজন মিটবে অন্যদিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সুরক্ষিত থাকবে যাতে তারাও স্বচ্ছন্দে পৃথিবীতে বাঁচতে পারে। এ হল উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখার প্রচেষ্টা থেকে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণার পথচলা।

সহকারি অধ্যাপক
দুর্গাপুর ওমেন্স কলেজ

google

ফুকুশিমার তেজস্ক্রিয় জল কতখানি নিরাপদ?

সঞ্জিত কুমার সাহা

"ফকুশিমার জল সাগরে ফেলার অনুমতি' সম্পর্কিত কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যের সংযোজনে আইএইএ রিপোর্ট বলছে এই পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিস্রুত জলে যতটুকু তেজস্ক্রিয়তা আছে, তা পরিবেশের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এটা সর্বতোভাবে ঠিক নয়।

গত ২৯ জুন, ২০২৩ এ প্রকাশিত বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা "নেচার' এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ৬৪'র মধ্যে ৬২ টি তেজস্ক্রিয় মৌল যথাসম্ভব নিষ্কাশিত করা হয়েছে পরিস্রুত জল থেকে। 'উন্নত তরল প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির' মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় জল পরিস্রুতকরণের কাজটি করেছে 'টোকিও বিদ্যুৎ শক্তি সংস্থা'। তবে যে দুটি তেজস্ক্রিয় মৌল এই জলে থেকে গেছে তা হল 'কার্বন-১৪' এবং 'হাইড্রোজেন-৩' বা 'ট্রিটিয়াম'। এক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য 'কার্বন-১৪'র অর্ধজীবনকাল ৫০০০ বছরেরও বেশি এবং 'ট্রিটিয়ামে'র অর্ধজীবনকাল হলো ১২.৩ বছর। বর্তমান পদ্ধতির মাধ্যমে যদিও 'ট্রিটিয়াম'কে পৃথকীকরণ সম্ভব হয়নি, কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয় মেনে আগামী দিনে হয়তো 'ট্রিটিয়াম' নিঃশেষিত হবে পরিস্রুত জল থেকে। তবে একথাটি 'কার্বন-১৪' তেজস্ক্রিয় মৌল'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যেহেতু তার অর্ধজীবনকাল ৫০০০ বছরেরও বেশি।

এই দুই তেজস্ক্রিয় মৌল বর্তমানে যেহেতু ঐ পরিস্রুত জলে বিদ্যমান, তাই ঐ জল সমুদ্রে ফেললে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সমুদ্রের জীবকুলে সঞ্চিত হবে। সামুদ্রিক মাছ ভক্ষণকারী অন্যান্য সামুদ্রিক জীবে তেজস্ক্রিয় মৌল জমা হতে শুরু করলে তার পরিমান 'জৈবসঞ্চায়ন (বায়োঅ্যাকুমুলেশন)' পদ্ধতিতে আরো বর্ধিত হবে।

যদিও ৩০ বছর ধরে ধীরে ধীরে ঐ পরিস্রুত জল সমুদ্রে নিক্ষেপ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তবুও ১০০০টি ট্যাঙ্কে সঞ্চিত, ৫২০টি অলিম্পিক মাপের সাঁতার পুলের সমপরিমাণ জলে 'ট্রিটিয়াম' ও 'কার্বন-১৪' 'র বর্তমান ঘনত্ব বা পরিমাণকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

মৎস্যজীবিদের জীবিকা নির্ভর করে আছে এই সামুদ্রিক মাছের উপর।শুধু তাই নয়, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলিও এই সামুদ্রিক মাছ বিদেশে রপ্তানি করে এবং তা থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। শুধু সামুদ্রিক জীব নয়, আগামী দিনে সামুদ্রিক মাছ থেকে খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে মানবদেহেও এই তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির প্রবেশের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এক্ষেত্রে জিনগত প্রভাবও পড়তে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান পরিস্থিতিতেও ফুকুশিমা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১০০০ টি ট্যাঙ্কের জল থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হচ্ছে। কিন্তু পরিশেষে এটা বলা যাই যে, আরো উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে 'কার্বন- ১৪' এবং 'ট্রিটিয়াম'কে পরিস্রুত জল থেকে পুরোপুরি নিষ্কাশিত/নিঃশেষিত করার পরেই সম্পূর্ণ তেজস্ক্রিয়তামুক্ত পরিস্রুত জল প্রশান্ত মহাসাগরের নিরাপদস্থানে ফেলা উচিত শুধু পরিবেশের স্বার্থে এবং সমগ্র জীবকুলের স্বার্থে।

ডেপুটি বন সংরক্ষক,
অরণ্য ভবন, কলকাতা,

google

অহিংসা সিল্ক

মালবিকা সেনগুপ্ত

ভারতে রেশম কীটের চাষ ও রেশম শাড়ী উৎপাদন এক বহু পুরোনো পদ্ধতি। ভারতে এই রেশম শিল্পের আগমন ঘটে চীন দেশ থেকে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাণভট্টের হর্ষচরিত প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথিতে রেশমবস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। হিউয়েন-সাং, মেগাস্থিনিস, তাবার্নিয়ের, রালফ ফিচ প্রমুখ পরিব্রাজকরা প্রাচীন ভারতে রেশম বস্ত্রের ব্যবহার ও চীন, আরব প্রভৃতি দেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করতে দেখেন।

এই বস্ত্রশিল্পের সাথে বিভিন্ন প্রজাতির রেশম কীটের জীবনচক্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। Bombyx mori, Antheraea mylitta, Antheraea paphia, Antheraea assamensis ইত্যাদি রেশমকীট রেশমবস্ত্র তৈরি করে। অপর পক্ষে মালবেরি,অর্জুন,শাল, সোম, সুয়ালু প্রভৃতি গাছের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এই গাছের পাতা খেয়েই রেশমকীটগুলি পরিপুষ্ট হয়।

রেশমকীটগুলির জীবন চক্রাকারে চারটি স্টেজের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। এই স্টেজগুলি হলো ডিম লার্ভা, পিউপা ও মথ। স্ত্রী মথ গাছের পাতায় ডিম পারে। একজন স্ত্রী মথ সাধারণতঃ ৩০০-৩৫০ ডিম পারে। ডিম ফুটে লার্ভা বা রোমশ রেশমকীট নির্গত হয়। লার্ভা প্রচুর পরিমানে গাছের পাতা খেতে থাকে। প্রায় ৩০ দিন পরে পরবর্তী স্টেজ-এ পৌঁছায়। লার্ভা গুলি এরপরে নিজের চারপাশে সিল্ক সুতো দিয়ে তৈরি কোকুনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ও পিউপা তে পরিণত হয়। নিজেকে পরিবেশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই এই আত্মরক্ষার পদ্ধতি গ্রহণ করে। পিউপা অবস্থাতে কীটগুলি একেবারেই নড়াচড়া করে না। কোকুনের মধ্যে ১২-১৪ দিন থাকার পরে পূর্ণাঙ্গ মথ বেরিয়ে আসে। জীবনচক্র সম্পূর্ণ হতে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ সময় লাগে।

রেশমশিল্প একটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে এই রেশমকীট-এর পরিচর্যা, গাছের যত্ন ও কোকুন থেকে সিল্ক সুতোগুলিকে আলাদা করা হয়ে থাকে। রেশম সুতোগুলি আলাদা করার জন্য কোকুনগুলি কে ফুটন্ত গরম জলে ফেলা হয় এবং কোকুনের উপরের স্তরটি নরম হয়ে যায়। ভিতরের রেশমকীটগুলি মরে যায় এবং সেরিসিন নামক কেমিক্যাল আলগা হয়ে যাওয়াতে নরম ও লম্বা রেশম তন্তু বার করে নেওয়া হয়ে থাকে।

এইভাবে রেশমতন্তু নিষ্কাশন পদ্ধতি এক অবলা জীব হত্যার সামিল। এক কষ্টকর ও নিষ্ঠুর পদ্ধতি অবলম্বন করে রেশমবস্ত্র উৎপন্ন হয়ে থাকে।

এই পদ্ধতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুসুম রাজাইয়া নামে এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি

কর্মচারী অহিংস পদ্ধতিতে রেশমতন্তু নিষ্কাশনের কথা চিন্তা করলেন। তিনি নিজে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। ১৯৯০ সালে তাঁর ৪০ বছরের রেশম চাষের অভিজ্ঞতা নিয়ে অহিংস পদ্ধতিতে এই কর্মকান্ড শুরু করলেন।

অহিংসার পাশাপাশি এই চাষ পরিবেশবান্ধব ও বটে। রেশমকীটের কোনোরকম ক্ষতি না করে এই সিল্ক প্রস্তুত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে রেশমকীটের পুরো জীবনচক্রটি সংঘটিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে কোকুনটিকে গরম জলে সিদ্ধ করার চল নেই। সম্পূর্ণ ঢাকা জায়গাতে মথটি পুরো জীবনচক্র শেষ করে যখন কোকুন থেকে বেরিয়ে আসে তখন সেই কোকুনগুলিকে আলাদা করে নিয়ে এসে রেশম তন্তু গুলি ছাড়ানো হয়ে থাকে। কোনোরকম ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয় না।

এই জন্য এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন রেশম কে অহিংসা সিল্ক বলা হয়ে থাকে। পরিবেশের প্রতিও নজর রাখা হয়। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে এই চাষ হয়। এই চাষ এ গাছে কোনোরকম ভাবে ফাঙ্গিসাইড, কীটনাশক দ্রব্য, জেনেটিক স্প্রে ব্যবহার হয় না।

অন্যান্য কীটপতঙ্গ ও পাখীর হাত থেকে গাছ গুলিকে রক্ষা করার জন্য গাছগুলিকে নেট দিয়ে আবৃত করা হয় থাকে। যেহেতু মথটিকে পূর্ণাঙ্গ হতে সময় দেওয়া হয় থাকে,তাই এই সিল্ক উৎপাদন করতে ১০/১২ দিন সময় আরো বেশি লাগে। মটকা, এরি সিল্ক এই অহিংসা সিল্কের অন্তর্গত।

ভারতীয় দর্শন অহিংসাকে বরাবরই গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন ধর্মের মূলমন্ত্র হলো অহিংসা। এই রেশমচাষ অহিংসাকেই বরণ করে নিয়েছে, ভারতকে দান করেছে এক নির্মল, পবিত্র ও পরিবেশবান্ধব রেশমবস্ত্র।

বিজ্ঞান শিক্ষিকা ও ইসনা ছাত্রী

জাতীয় বিজ্ঞান পোস্টার প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের (ইসনা) উদ্যোগে বিজয়গর জ্যোতিষ রায় কলেজে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আন্তঃমহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বিজ্ঞান পোস্টার প্রতিযোগিতা। পোস্টার প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল (Indigenous Technologies for Viksit Bharat) -- বিকশিত ভারতের জন্য দেশীয় প্রযুক্তি। এ বিষয়টি এ বছরের ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের মূল ভাবনা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের অধ্যক্ষা ড. রাজশ্রী নিয়োগী। পোস্টার প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরের প্রায় ১৫ টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন । এই প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অধ্যাপক মানস চক্রবর্তী এবং ইসনার সদস্য শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন জেআইএস ইউনিভার্সিটির মানবি জয়সওয়াল ও মেঘা চৌধুরী। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের রুদ্র শংকর কর্মকার। তৃতীয় স্থানে ছিলেন মানকর কলেজের শেখ হাজিকুল আলম ও দেবজিৎ গোস্বামী।

এছাড়াও কিছু বিশেষ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয় স্কটিশ চার্চ কলেজের দেবলীনা জানা, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের রাজ্যশ্রী বসু ও দিয়া ঘোষ, দমদম মতিঝিল কলেজের কঙ্কনা মন্ডল, টেকনো ইন্টারন্যাশনালের (নিউটাউন) সৌরিমা পাল।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. শিলাজিৎ বড়ুয়া।

ইসনার অন্যতম প্রবীণ সদস্য অধ্যাপক বলরাম মজুমদারকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে

ইসনার অন্যতম প্রবীণ সহ-সভাপতি অধ্যাপক সুনীল কুমার তলাপাত্রকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে

ইসনার ৩৬তম পাঠক্রমের মানপত্র প্রদান করা হচ্ছে

ইসনার ৩৬তম পাঠক্রম সমাপ্তি অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

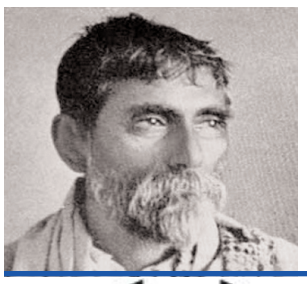

বিজ্ঞান কহন

কলকাতা/ফেব্রুয়ারী ২৯, ২০২৪, বৃহস্পতিবার, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

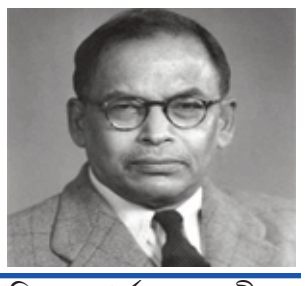

শুধু পাঠকের জন্য

প্রশান্ত কুমার বসু

পরিতোষ ভট্টাচার্য্য মূলত একজন কবি। কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ তাঁর ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। তবে শুধু কাব্যজগতেই তিনি তাঁর বিচরণ সীমাবদ্ধ রাখেননি। সাহিত্যের অন্য আঙ্গিনায়ও তাঁর অনায়াস যাতায়াত। একাধারে তিনি লেখক। অন্যদিকে তিনি প্রাবন্ধিক, আলোচক। কিন্তু তাঁর এই প্রাথমিক পরিচিতি বাদ দিলে তিনি প্রধানত একজন প্রথিতযশা কৃষি বিজ্ঞানী। জৈব সারের তত্ত্ব ও তথ্য প্রয়োগে ও উপযোগিতা বোঝাতে তিনি দেশের অন্যতম প্রবক্তা। তারই ফসল তাঁর সাম্প্রতিকতম সংকলন গ্রন্থ "শুধু পাঠকের জন্য" যা ধারে ও ভারে মনে অবলীলায় দাগ কেটে যায়। বইটির সম্পর্কে প্রকাশক লিখছেনঃ বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে কোথাও কোন রেষারেষি আছে বলেমনে হয় না বিজ্ঞান যুক্তিপূর্ণ ও সাহিত্য আবেগনির্ভর। গবেষণার বিষয়বস্তুর প্রতি যদি সত্যিকারের আবেগ না থাকে তবে গবেষণা সার্থক হয় না। তেমনি অযৌক্তিক বিষয়বস্তু নিয়ে সাহিত্য গড়ে ওঠে না। তাই বিজ্ঞান ও সাহিত্য পরস্পরের পরিপূরক। লেখক ডঃ পরিতোষ ভট্টাচার্য্য তেমনই এক ব্যক্তিত্ব যিনি বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে পাশাপাশি সঙ্গে নিয়ে চলেন। লিখতে গেলে প্রথম লক্ষ্য ভাষা চয়ন। সেদিকে তাঁর প্রখর নজর। স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় কি করে পাঠকের কাছে সহজে পৌঁছনো সম্ভব তার একটি নমুনা সংকলনের অন্যতম প্রবন্ধ "প্রাচীন কৃষির যাত্রাপথে" থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখছেনঃ মানুষের আগমনের মধ্যে দুটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। যেমন ৫০,০০০ বছর আগে বৌদ্ধিক বিপ্লব ও ১২,০০০ বছর আগে কৃষি বিপ্লব। মনে রাখতে হবে পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই ভাষার সৃষ্টি হয়, মানুষ পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন শুরু করে এবং ভাবনা চিন্তা করতে আরম্ভ করে দেয়। একদিন যারা সমাজবদ্ধ না থেকে শুধু মাত্র শিকার করে এবং ফলমুল খেয়ে বাঁচতো, তারাই বারো হাজার বছর আগে সমাজবদ্ধ হবার চেষ্টা করে এবং কৃষি কাজের উদ্যোগ নেয়। কৃষি বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের মেলবন্ধনে এই যে ভাষার চর্চা এ কি কারও পক্ষে বোঝা অসম্ভব? আর এখানেই বিজ্ঞানী ও লেখক পরিতোষ ভট্টাচার্যের মুন্সীয়ানা। আবার "জীব বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বৌদ্ধিক বৈচিত্র্য" শীর্ষক একটি সমীক্ষায় তিনি লিখছেন আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় একটা সংকট হল জলবায়ু পরিবর্তন। এই জলবায়ু সংকট যত বাড়বে খাদ্য নিরাপত্তা তত ভাঙতে থাকবে।তবে প্রবন্ধকার পরিতোষের দুর্বলতা যে বিজ্ঞান তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং সে সন্দেহ নিরসন হবে "বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এক সমীক্ষা" শিরোনামের রচনাটি পড়লে। এখানে উনি "বিজ্ঞান প্রীতি" অনুচ্ছেদে লিখছেন এই দুই অসামান্য ব্যক্তি সাহিত্য চর্চা ছাড়া বিজ্ঞানের প্রতিও মনোনিবেশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন বিজ্ঞান চর্চার এক অনুরক্ত যোদ্ধা। জীবন থেকে কুসংস্কার, অসঙ্গতি ও সংশয় যাতে দূর হয়ে যায় তার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র ১০টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার মধ্যে ৯টি প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় Indian Association for the Cultivation of Science তৈরিতে বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই সাহায্যর হাত বাড়িয়েছিলেন। এক হাজার টাকার কাছাকাছি অর্থ দান করেছিলেন, তখনকার দিনে যার মূল্য অনেক। মোট ১৭টি রচনার আশ্চর্য এই সংকলন যাঁদের জন্য গ্রন্থিত সেই পাঠকেরা পড়লেই বুঝতে পারবেন কিভাবে একাধারে বিজ্ঞানমনস্ক ও অপর দিকে সংস্কৃতিমনস্ক পরিতোষ ভট্টাচার্য্যের সম্মিলনের প্রতিফলন ঘটেছে এই বইটিতে। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকলেও তাঁর বাংলা লেখালেখিতে যে কোন ছেদ পড়েনি তার অন্যতম উদাহরন "শুধু পাঠকের জন্য"। প্রচুর পড়েছেন, গবেষণা করেছেন, তথ্য সংগ্রহও করেছেন। ফলে একেক সময় সংস্কারকের ভুমিকায়ও ওঁকে দেখা দিয়েছেন। গত বছর বইমেলায় প্রকাশ করতে গিয়ে হয়তো একটু তাড়াহুড়োয় কিছু মুদ্রন প্রমাদ ঘটে গিয়েছে, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের হয়তো একটু ঘাটতি পড়েছে, তবে আগামী সংস্করণে এই ছোটখাট ভুলত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। সে আক্ষেপ নিশ্চয়ই ওঁরও রয়েছে। নাহলে কবি T. S. Eliot এর উদ্ধৃতি দিয়ে উনি বলতেন না:Where is the life we have lost in livingWhere is the knowledge we have lost in information Where is the wisdom we have lost in knowledge.

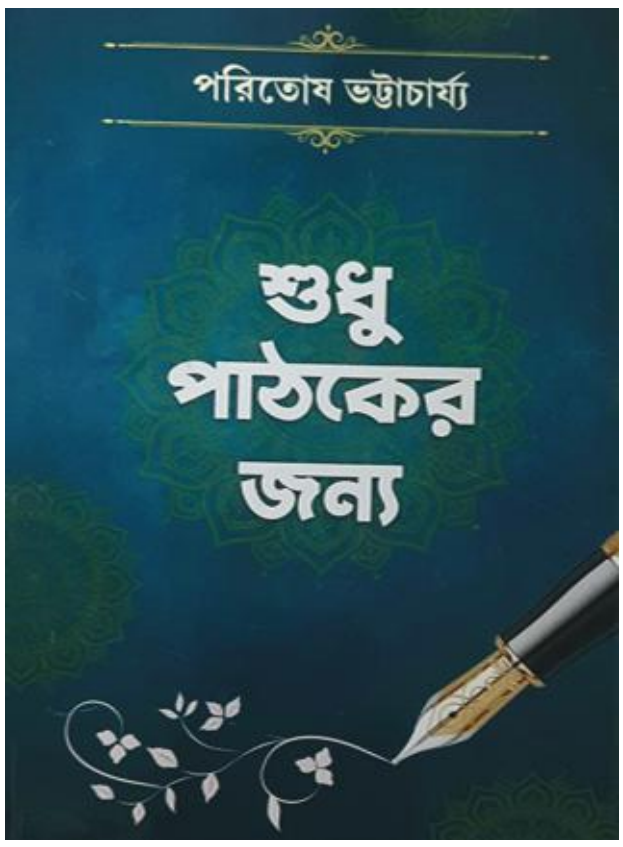

শুধু পাঠকের জন্য, পরিতোষ ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক: সৃজন পাবলিশার্স,
কলকাতা ৭০০০১২, মূল্য ৩০০ টাকা

সম্পাদক, বিজ্ঞান কহন
boseprasanta@hotmail.com

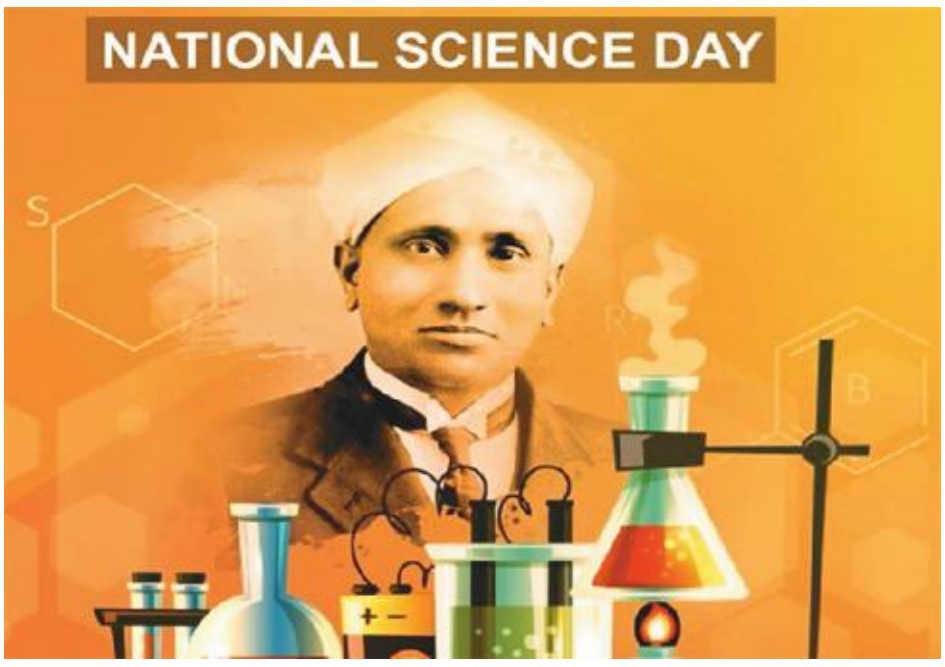

সম্পাদকীয় সন্দেশ

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনাদের আনুকূল্যে আমাদের পত্রিকা "বিজ্ঞান কহন" - এর দ্রুত প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। এমন কি মুদ্রিত সংস্করণগুলিও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এ জন্য আপনাদের অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা একই সঙ্গে নতুন বিভাগেরও সূচনা এবং পরিকল্পনা করেছি। এই সংখ্যা থেকে আমাদের পুস্তক সমালোচনা বিভাগ - বই - জ্ঞান-এর সূত্রপাত হচ্ছে। মূলত বিজ্ঞান ভিত্তিক বইয়েরই প্রাধান্য থাকবে। তবে মাঝে, মাঝে ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে। আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনারা আমাদের কার্যালয়ে বই পাঠান এবং নিজেরাও পুস্তক সমালোচনায় অংশ নিন। আপনাদের সমর্থন পেলে আমরা আগামী দিনে চিঠিপত্র বিভাগ শুরু করব।

নিবন্ধ পাঠানোর ই-মেল

bigyankahon@gmail.com

সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদক: প্রশান্ত কুমার বসু
যুগ্ম সম্পাদক: অর্ণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক: সুকল্যাণ গাইন

সদস্য: পথিক গুহ, সুধেন্দু মণ্ডল, টি ভি ভেঙ্কটশরণ, মানস চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, অমিত কৃষ্ণ দে, সুমিত্রা চৌধুরী, বুড়োশিব দাশগুপ্ত, দেবপ্রসন্ন সিংহ, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, মানসপ্রতিম দাস, শঙ্করাশিস মুখোপাধ্যায়, সীমা মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী দে, আশিস দাস, অর্পিতা চক্রবর্তী, রাতুল দত্ত ও বকুল শ্রীমানী

সম্পাদনা-সহকারী
তুহিন সাজ্জাদ সেখ, সেখ জিন্নাত আলি, অনির্বাণ দে, সৈকত কুমার বসু, শেফালিকা ঘোষ সমাদ্দার, ঝুমুর দত্তগুপ্ত, সায়রী বিশ্বাস

কারিগরি উপদেষ্টা: শিব শঙ্কর দত্ত

৩৬ তম ট্রেনিং পোগ্রাম অন সায়েন্স কমিনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস,
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন,
৯২, এ পি সি রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ -এর পক্ষে
ড. অমিত কৃষ্ণ দে ও ড. টি ভি ভেঙ্কটশরণ কর্তৃক প্রকাশিত
ই-মেল- isnatraining@gmail.com
website: www.scienceandculture-isna.org

© ISNA: Articles may be reproduced with due acknowledgement to ISNA